ন. নোসভ

আমুদে পরিবার

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

Н. НОСОВ

ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙКА

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্কন: ভ. ইয়া. কনোভালোভ্

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: ভ. পুশ্‌কারিওভা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

ঘটনাটা ঘটেছিল যখন মিশ্‌কা আর আমি একটি টিনের কৌটো দিয়ে স্টিম-ইঞ্জিন তৈরী করতে চেষ্টা করেছিলাম, যেটা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। টিনের কৌটোর জলকে মিশ্‌কা বেশী গরম করে ফেলেছিল ফলে সেটা ফাটে আর গরম বাষ্পে তার হাত পুড়ে যায়। তার কপাল ভালো তার মা সঙ্গে সঙ্গে পোড়ার ওপর ন্যাপ্‌থা মলম লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ন্যাপ্‌থা চমৎকার ওষুধ। আমার কথায় বিশ্বাস না হলে নিজে লাগিয়ে দেখ। কিন্তু মনে রেখো পোড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মলমটা ঘষতে হবে ফোস্কা পড়ার আগেই।

তারপর হলো কি আমাদের স্টিম-ইঞ্জিন ফাটবার পর থেকে সেটা নিয়ে মিশ্‌কার মা আমাদের আর খেলতে দিলেন না, আবর্জনা ফেলার জায়গায় সেটা ফেলে দিলেন। কিছুদিন ধরে আমরা কী যে করবো ভেবে পেলাম না। ফলে ভারি একঘেয়ে লাগতে লাগলো।

তখন সবে বসন্তকাল স্ুরু হয়েছে। সর্বত্র বরফ গল্‌ছে। ছোট ছোট স্রোতে জল রাস্তায় গিয়ে পড়ছে। জানালার ভিতর দিয়ে বসন্তকালের উজ্জ্বল রোদ ঝিক্‌মিক

করছে। কিন্তু মিশ্‌কা আর আমি ভারি মনমরা হয়ে পড়েছি। আমরা দুজন খাপছাড়া ধরণের—কিছু করার না থাকলে আমরা খুসী হই না। আর যখন কিছু করার থাকে না আমরা নিরুৎসাহ হয়ে বসে থাকি। যতক্ষণ না করার মত নতুন কিছু খুঁজে পাই।

একদিন মিশ্‌কার সঙ্গে দেখা করতে এসে দেখলাম টেবিলের সামনে বসে দুহাতে মাথা ধরে খুব মন দিয়ে সে একটা বই পড়ছে। পড়তে সে এত ব্যস্ত ছিল যে আমি যে এলাম তা সে শুনতেই পায়নি। খুব জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দেবার পর সে মুখ তুলে চাইলো।

—আরে, নিকলাদ্‌জে যে!—এক মুখ হেসে সে বললো।

মিশ্‌কা কখনো আমার আসল নাম ধরে ডাকে না। সবাই আমায় যেমন 'কোলিয়া' বলে ডাকে সে ভাবে না ডেকে যত সব কিম্ভূত নাম সে বার করেছে, যেমন নিকোলা, মিকোলা, মিকুলা সেলিয়ানিনভিচ* কিম্বা মিক্‌লুখো-মাক্‌লাই, এমন কি একবার সে আমায় নিকোলাকি বলেও ডেকেছিল। প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন নতুন নামে আমায় সাড়া দিতে হয়। আমি কিন্তু কিছু মনে করি না, যতক্ষণ তার ভাল লাগে সে ডাকুক।

আমি বল্‌লাম, 'হ্যাঁ আমিই। তোর কাছে ওটা কী বই রে?'

—ভারি মজাদার বই রে,—মিশ্‌কা বল্‌লো।—এক খবরের কাগজের দোকানে আজ সকালে কিনেছি।

বইটার দিকে তাকালাম। বইটার নাম 'মুরগি-চাষ'। মলাটে একটা মুরগি ও মোরগের ছবি আর প্রত্যেক পাতায় আঁকা মুরগির জন্যে নানা ধরণের খাঁচা ও নক্সা।

আমি বল্‌লাম, 'এর মধ্যে আর মজা কি আছে। আমার তো মনে হয় কোনো জাতের বিজ্ঞানের বই এটা।'

—সে কারণেই তো এটা এতো মজাদার। এটা তোর ছেলেমানুষী রূপকথার গল্প নয়। এর ভেতর যা আছে প্রত্যেকটিই সত্যি কথা। এটা দরকারী বই, বুঝলি?

---

* মিকুলা সেলিয়ানিনভিচ—রুশী লৌকিক উপকথার নায়ক।

মিশ্‌কা সেই জাতের ছেলে যাদের সব কিছু দরকারী জিনিসের উপর জেদ। হাত খরচের জন্যে সামান্য পয়সা পেলেই এই বইটার মতো দরকারী কিছু না কিছু সে কিনে ফেলে। একবার সে একটা বই কিনেছিল তার নাম 'চেবিশেভ-এর ইনভার্স ট্রিগনমেট্রিক ফাঙ্কশন্‌স এবং পলিনোম্‌স্‌'। বলা বাহুল্য সে এক অক্ষরও বুঝতে পারেনি, তার ফলে সে ঠিক করেছে যতদিন না ওটা বুঝবার মতো বুদ্ধি তার হয় ততদিন ওটা সরিয়ে রাখবে। সেই থেকেই ওটা তাকে পড়ে আছে, অপেক্ষা করছে মিশ্‌কার বুদ্ধি হওয়ার জন্যে।

যে পাতাটা পড়ছিল সে পাতায় দাগ দিয়ে বইটা সে বন্ধ করলো।

—তুই এই বইটা থেকে সব রকমের জিনিসই শিখতে পারবি,—সে বল্‌লো:— কেমন করে মুরগি, পাতিহাঁস, হাঁস, টার্কিদের সংখ্যা বাড়াতে হয় সে সব কথাই আছে।

—তুই নিশ্চয়ই টার্কিদের সংখ্যা বাড়াবার কথা ভাবছিস না?

—না, কিন্তু তা সত্বেও এটা পড়তে ভালো লাগছে। একটা যন্ত্র বানানো যায় যার নাম 'ইন্‌কুবেটর' যেটা দিয়ে মুরগি ছাড়াও ডিম ফোটানো যাবে।

—আহা!—আমি বল্‌লাম,—সবাই এ কথা জানে। এমন কি আমি একবার দেখেছিও গতবছর যখন মা-র সঙ্গে যৌথখামারের মুরগিখানায় গিয়েছিলাম তখন। যন্ত্রটা দিনে পাঁচশো এমন কি হাজারটা ডিমও ফোটাতে পারে। বাচ্চাগুলোকে বার করবারই সময় পাওয়া যায় না।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'সত্যি! আমি এটা একেবারেই জানতাম না। আমি ভাবতাম শুধু মুরগিরাই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে পারে। আমরা যখন গ্রামে থাকতাম তখন দেখতাম মুরগিরা ডিমে তা দিচ্ছে।'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে রকম মুরগি আমিও অনেক দেখেছি। কিন্তু ইন্‌কুবেটর অনেক ভালো। একটা মুরগি একসঙ্গে মাত্র দশটা ডিমে তা দিতে পারে, কিন্তু একটা ইন্‌কুবেটর পারে হাজারটা ডিমে তা দিতে।

—আমি জানি,—মিশ্‌কা বল্‌লো।—বইতেও সে কথা বলেছে। আরো একটা কথা আছে। একটা মুরগি যখন ডিমে তা দেয় কিম্বা বাচ্চাদের দেখাশোনা করে

তখন আর ডিম পাড়ে না, কিন্তু তোমার যদি ইন্‌কুবেটর থাকে বাচ্চা ফোটাবার জন্যে তাহলে মুরগিটা ক্রমাগত ডিম পেড়ে যেতে পারে তাতে অনেক বেশী ডিম পাওয়া যেতে পারে।

আমরা হিসেব করতে বসে গেলাম আরো কত বেশী ডিম পাওয়া যেতে পারে যদি সমস্ত মুরগিগুলো ডিমে তা না দিয়ে ডিম পেড়ে যায়। একুশ দিন ধরে ডিমে তা দিয়ে একটা মুরগি বাচ্চা ফোটাতে পারে। তারপর যতদিন ধরে বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা সে করে সেটা যোগ করলে দেখা যায় আবার ডিম পাড়তে মুরগিটার তিন মাস সময় যাবে।

—তিন মাস, মানে নব্বুই দিন,—মিশ্‌কা বল্‌লো।—যদি মুরগিটা দিনে একটা করেও ডিম পাড়ে তাহলে বছরে সে নব্বুইটা ডিম বেশী পাড়তে পারবে। যদি না তাকে ডিমে তা দেবার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। এমনি কি একটা ছোট মুরগিখানাতে যেখানে অন্তত দশটা মুরগি আছে সেখান থেকেও বছরে ন'শটা ডিম বেশী পাওয়া যাবে। আর যদি কোনো বিরাট যৌথখামার কিম্বা রাষ্ট্রীয় খামারের মুরগিখানার কথা ধরা যায় যেখানে হাজারটা মুরগি আছে, তাহলে সেখান থেকে নব্বুই হাজার বাড়তি ডিম পাওয়া যাবে। ভাব্ একবার! নব্বুই হাজার ডিম!

আমরা অনেকক্ষণ ধরে ইন্‌কুবেটরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তারপর মিশ্‌কা বল্‌লো:

—শোন আমি বলি কি আমাদের জন্যে একটা ছোট্ট ইন্‌কুবেটর তৈরী করা যাক, ফোটানো যাক কয়েকটা ডিম।

—আমরা কি করে করবো?—আমি জিগ্‌গেস করলাম।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা তৈরী করা সহজ নয়।

—আমার মনে হয় না এটা খুব কঠিন হবে,—মিশ্‌কা বল্‌লো।—বইতেই তো এর সম্বন্ধে সব বলে দিয়েছে। আসল কথা হচ্ছে সমানে একুশ দিন ডিমগুলো গরম রাখতে হবে এবং তারপর মুরগিছানারা আপনি ডিম ফেটে বেরিয়ে আসবে।

আমাদের ছোট ছোট মুরগিছানা হবে এই কথা ভাবতেই ভাবনাটা খুব মনে ধরলো। আমি সব রকম পশু-পাখীই খুব ভালোবাসি। মিশ্‌কা আর আমি গতবছর শরৎকালে স্কুলে ছোটদের প্রাণিতত্ত্ববিদ মণ্ডলীতে যোগ দিয়েছিলাম আর আমাদের পোষা জীব-জন্তু নিয়ে কিছু কাজও করেছিলাম। কিন্তু তখন মিশ্‌কার মাথায় স্টিম-ইঞ্জিন তৈরী করার মতলব চেপেছিল ফলে আমরা সেই মণ্ডলীতে যাওয়া বন্ধ করেছিলাম। মণ্ডলীর সর্দার ভিতিয়া স্মির্নোভ বলেছিল যদি আমরা কোনো কাজ না করি তাহলে তালিকা থেকে আমাদের নাম কেটে দেবে, কিন্তু আমরা বলেছিলাম আমাদের আর একবার সুযোগ দিতে।

মিশ্‌কা কল্পনা করতে লাগলো আমাদের মুরগিছানাগুলো যখন ডিম ফেটে বেরিয়ে আসবে তখন কি মজাই না হবে।

—বাচ্চাগুলোকে দেখতে কি মিষ্টিই না হবে,—সে বল্‌লো।—আমরা রান্নাঘরের কোণে তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে পারি, আর তারা থাকতেও পারে সেখানে। আমরা তাদের খাওয়াবো আর দেখাশোনা করবো।

—হঁ্যা, কিন্তু তার আগে আমাদের আরো অনেক কিছু করতে হবে। ভুলিস না তিন সপ্তাহ লাগবে তাদের ডিম ফুটে বেরোতে!—আমি বল্‌লাম।

—তাতে হয়েছে কি? আমাদের শুধু একটা ইন্‌কুবেটর তৈরী করতে হবে, মুরগিছানারা নিজেই ডিম ফুটে বের হবে।

আমি একটুক্ষণ ভাবলাম। মিশ্‌কা উৎকণ্ঠার সঙ্গে আমার দিকে তাকালো। আমি দেখলাম সে এখুনি কাজ করার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

—বেশ ভালো!—আমি বল্‌লাম।—আমাদের এখন আর কিছু করার নেই। এটাই করা যাক।

—আমি জানতাম তুই রাজি হবি!—মিশ্‌কা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো।—আমি একলাই ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু তুই ছাড়া অর্ধেকও মজা হতো না তাতে।

অতর্কিত বাধা

—বোধ হয় আমাদের ইন্‌কুবেটরের দরকার হবে না। ডিমগুলোকে শুধু সস্‌প্যানে বসিয়ে উনুনে বসানো যাক,—আমি প্রস্তাব করলাম।

—না, না, একেবারেই ঠিক হবে না!—মিশ্‌কা হাত পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠলো। —আগুন নিভে যাবে আর ডিমগুলো নষ্ট হবে। ইন্‌কুবেটরের বিশেষত্ব এই তার ভেতরে তাপ সব সময় একরকম থাকে—১০২ ডিগ্রী।

—১০২ ডিগ্রী কেন?

—কারণ যে মুরগি ডিমে বসে তা দেয় তার গায়ের তাপ হচ্ছে ঐ।

—তুই কী বল্‌তে চাস মুরগিরও জ্বর হয়?—আমি ভাবতাম অসুস্থ হলে শুধু মানুষেরই জ্বর হয়।

—বোকা, সবাইকার গায়েই তাপ আছে, তারা অসুস্থ হোক আর না হোক। শুধু যখন শরীর অসুস্থ হয় তখন তাপ বাড়ে।

মিশ্‌কা বই খুলে একটা নক্সার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো।

—এই দেখ, আসল ইন্‌কুবেটর দেখতে এই রকম। এইটে জল রাখার পাত্র, আর এই ছোট পাইপটা গেছে জল রাখার পাত্র থেকে বাক্সে যেখানে ডিমগুলো আছে। জল রাখার পাত্রকে নীচে থেকে গরম করা হয়। গরম জল পাইপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ডিমগুলোকে গরম করে। এই দেখ, এখানে থারমোমিটার রয়েছে ফলে তুই তাপমাত্রার দিকে নজর রাখতে পারবি।

—কোথা থেকে আমরা ঐ রকম একটা জল রাখার পাত্র পাবো?

—আমাদের জল রাখার পাত্রের দরকার নেই। তার বদলে আমরা খালি টিনের কৌটো ব্যবহার করবো। আমরা কেবল একটা ছোট্ট ইন্‌কুবেটর তৈরী করতে যাচ্ছি।

—কি করে আমরা সেটাকে গরম করবো?—আমি জিগ্‌গেস করলাম।

—একটা সাধারণ কেরসিন বাতি দিয়ে। গুদমঘরে কোথাও একটা পুরোনো পড়ে আছে।

আমরা গুদমঘরে গিয়ে তার কোণে যে সব আবর্জনা আছে তার মধ্যে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। সেখানে পুরোনো বুট, গ্যালশ *, একটা ভাঙা ছাতা, একটা ভালো তাঁবার নল, আর অগুন্তি বোতল এবং খালি টিনের কৌটো। আমরা প্রায় সব জিনিস দেখে শেষ করেছি এমন সময় হঠাৎ আমার নজরে পড়লো তাকের ওপর একটা বাতি রয়েছে। মিশ্‌কা তাক বেয়ে উঠে সেটাকে পেড়ে আন্‌লো। সেটা ধূলোয় ভর্তি কিন্তু কাঁচটা আস্ত আর তার মধ্যে এমন কি পল্‌তেটাও রয়েছে। আমরা খুসীতে ফেটে পড়ে বাতি, তাঁবার নল আর একটা বড় গোছের টিনের কৌটো নিয়ে রান্নাঘরে এলাম।

প্রথমে মিশ্‌কা বাতিটা পরিষ্কার করে কেরসিন ভরলো। তারপর জ্বালিয়ে দেখলো সেটা কি রকম কাজ করছে। বেশ ভালোই জ্বলতে লাগলো সেটা। পল্‌তেটা বাড়িয়ে কিম্বা কমিয়ে খুসী মতো আগুণের শিখাকে বাড়ানো কমানো যেতে লাগলো।

বাতিটা নিবিয়ে আমরা ইন্‌কুবেটর তৈরীর কাজে লেগে গেলাম। প্রথমে আমরা পাতলা কাঠ দিয়ে বড় একটা বাক্স তৈরী করলাম। সেটায় প্রায় পনেরোটা ডিম ধরে। ডিমগুলো যাতে ভালো আর গরম থাকে তার জন্যে বাক্সের ভেতরটা প্রথমে তূলো তার উপর ফেল্‌ট দিয়ে ঘিরে দিলাম। তারপর আমরা বাক্সের ঢাকা তৈরী করলাম আর তাতে একটু খোলা জায়গা রাখলাম থারমোমিটারের জন্যে যাতে আমরা তাপমাত্রার দিকে নজর রাখতে পারি।

পরের কাজ হলো গরম করবার জিনিস তৈরী করা। টিনের কৌটোটা নিয়ে তাতে দুটো গোলগোল ফুটো করলাম, একটা ওপরে আর একটা নীচে। তাঁবার নলটাকে ওপরের ফুটোর সঙ্গে ঝেলে দিলাম, ইন্‌কুবেটর বাক্সের পাশে একটা ফুটো করলাম এবং নলটাকে ভেতরে আটকে দিলাম। নলটাকে এমনভাবে বাঁকালাম যাতে তার অন্য দিকটা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। তারপর নলটাকে টিনের কৌটোর তলার ফুটোয় ঝেলে দিলাম। বাঁকা নলটা বাক্সের ভিতরে মোটামুটি একটা তাপ বিকিরণ যন্ত্রের কাজ করবে।

---

* গ্যালশ—বর্ষার সময় পরবার রবার জুতো।

এখন দরকার বাতিটাকে এমন জায়গায় রাখা যাতে টিনের কৌটোটা গরম হয়। মিশ্‌কা একটা পাতলা কাঠের খাঁচা নিয়ে এলো। সেটাকে আমরা খাড়া করে দাঁড় করালাম, ওপরের দিকে একটা গোল ফুটো করলাম, আর তারপর এমনভাবে ইন্‌কুবেটরটাকে তার ওপর বসালাম যাতে টিনের কৌটোটা ঠিক ফুটোর ওপরে থাকে। বাতিটাকে নীচে রাখা হলো।

অবশেষে সব কিছু প্রস্তুত হলো। টিনের কৌটোয় আমরা জল ভরে বাতিটা জ্বালালাম। টিনের কৌটোর আর নলের ভেতরের জল গরম হতে সুরু হলো। থারমোমিটারের ভেতরকার পারা উঠতে আরম্ভ করলো আর ধীরে ধীরে ১০২ ডিগ্রীতে পৌঁছুলো। পারাটা আরো উঠতো যদি না ঠিক তখনই মিশ্‌কার মা এসে পড়তেন।

তিনি বল্‌লেন, 'তোরা দুটোয় এখানে আবার কি করছিস? সমস্ত জায়গায় কেরসিনের গন্ধ ছাড়ছে!'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এটা একটা ইন্‌কুবেটর।'

—ইন্‌কুবেটর আবার কী?

—এটা এমন একটা জিনিস যা দিয়ে ডিম থেকে মুরগির ছানা ফোটানো যায়।

—মুরগির ছানা? কি সব বকছিস?

—কী করে এটা করা যায় তোমায় আমি দেখাচ্ছি মা। ডিমগুলোকে এখানে রাখতে হবে আর এই বাতিটাকে এখানে···

—বাতিটা কী জন্যে?

—গরম করার জন্যে। বাতিটা চাই-ই চাই-ই। নাহলে কিছু হবে না।

—যত সব বাজে কথা। কেরসিনের বাতি নিয়ে তোদের আমি খেলতে দেব না। তোরা ওটা ওল্টাবি আর কেরসিনে আগুন ধরবে। না, না কিছুতেই এসব আমি হতে দেব না।

—লক্ষ্মীটি মা, আমরা খুব সাবধান হবো।

—না না, আমি কিছুতেই তোদের জ্বলন্ত বাতি নিয়ে খেলতে দেব না। এর পরে আবার কি কাণ্ড বাধাবি কে জানে! প্রথমে তুই গরম জলে পুড়লি আর এখন আবার চাস বাড়ীটাকে পোড়াতে!

মিশ্‌কা তার মা-র কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করলো, কিন্তু কোন ফল হলো না!

মিশ্‌কা দারুণ দমে গেল। সে বল্‌লো, 'আমাদের ইন্‌কুবেটরের বারোটা বেজে গেল!'

আমরা আর এক পথ বার করলাম

সেই রাত্রে আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমতে পারিনি। আমাদের ইন্‌কুবেটরের কথা ভাবতে ভাবতে আমি পূরো এক ঘণ্টা জেগে ছিলাম। প্রথমে ভাব্‌লাম আমার মা-কে অনুরোধ করি আমাদের কেরসিন বাতিটা ব্যবহার করতে দিতে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো তাতে কোনো ফল হবে না কারণ তিনি আগুনকে ভয়ানক ভয় পান। আমার কাছ থেকে সর্বদাই দেশলাই লুকিয়ে রাখেন। তা ছাড়া মিশ্‌কার মা বাতিটা নিয়ে গেছেন। কিছুতেই তিনি আমাদের সেটা ফেরৎ দেবেন না। বাড়ীতে প্রত্যেকে গভীর ঘুমচ্ছে। কিন্তু আমি শুয়ে শুয়ে সমস্যা সমাধানের জন্যে মাথা ঘামাতে লাগলাম।

অকস্মাৎ আমার মাথায় চমৎকার একটি পরিকল্পনা এলো: 'আচ্ছা, বিজলি বাতি দিয়ে জলটা গরম করলে হয় না?'

আমি নিঃশব্দে উঠে ডেস্কের বাতিটা সুইচ টিপে জ্বালালাম তারপর তাতে আঙুল ঠেকিয়ে দেখতে লাগলাম গরম হচ্ছে কি না। খুব তাড়াতাড়ি সেটা গরম হয়ে উঠলো, অল্পক্ষণের মধ্যে এতো তেতে উঠলো যে তাতে আর আমি আঙুল

ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। দেয়াল থেকে থারমোমিটারটা নিয়ে আমি বাতির ওপর ছুঁইয়ে রাখলাম। ভেতরকার পারা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ওপরে উঠে গেল। সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই যে বাতিটা প্রচুর তাপ ছড়াচ্ছে।

মনটা হাল্‌কা হয়ে গেল। থারমোমিটারটাকে দেয়ালে ঝুলিয়ে আমি শুতে গেলাম। এখানে বলে রাখি সে রাতের পর থেকে থারমোমিটারটা কখনোই ঠিকমতো কাজ করেনি। সে কথা আমরা কিছুকাল পরে আবিষ্কার করলাম। ঘরের ভেতরটা যখন ঠাণ্ডা থারমোমিটারে তখন শূন্যের ওপর ১০৪ ডিগ্রী দেখায়, আর যখন একটু গরম হয়ে ওঠে পারাটা সব পথ বেয়ে একেবারে ওপরে গিয়ে ঠেকে যতক্ষণ না ঝাঁকিয়ে সেটাকে নামানো হচ্ছে। সেটায় কখনো ৮৬ ডিগ্রীর কম নামতো না, ফলে থারমোমিটারের গণনা হিসেবে শীতকালেও উনুনটা গরম করার দরকার নেই। বাতিটার ওপর যখন আমি সেটা রেখেছিলাম তখনই বোধ হয় খারাপ করেছিলাম।

পরের দিন মিশ্‌কাকে আমার পরিকল্পনার কথা বল্‌লাম। স্কুল থেকে বাড়ী ফিরেই মা-র কাছ থেকে একটা পুরোনো টেবিল বাতি চেয়ে নিলাম। বাসনপত্র রাখার আলমারিতে বহুকাল ধরে সেটা পড়েছিল। আমরা ঠিক করলাম তখুনি সেটা পরীক্ষা করে দেখতে। সেটাকে আমরা বাক্সের মধ্যে কেরসিনের বাতির জায়গায় রাখলাম। জল পাত্রের কাছে বাল্‌ব্‌টাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মিশ্‌কা তার তলায় কয়েকটা বই গুঁজে দিলো। তারপর আমি সুইচ টিপে সেটা জ্বালালাম আর থারমোমিটারটার ওপর আমরা নজর রাখতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ ধরে কিছুই ঘটলো না। পারাটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। ভয় হলো আমাদের পরীক্ষায় কিছুই ঘটবে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জলটা গরম হতে সুরু হলো আর পারাটাও উঠতে আরম্ভ করলো।

আধঘণ্টায় সেটা ১০২ ডিগ্রী উঠলো।

আনন্দের আতিশয্যে মিশ্‌কা হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো:

—হুররে, ঠিক এই তাপই মুরগিছানাগুলোর জন্যে আমাদের চাই!··· তাহলে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎশক্তি কেরসিনের মতই ভালো!

আমি বল্‌লাম, 'নিশ্চয়ই, ভালো বই কি। সত্যি কথা বলতে কি বিদ্যুৎশক্তি

অনেক ভালো। কারণ কেরসিনের বাতি থেকে আগুন লাগতে পারে কিন্তু বিদ্যুৎশক্তি একেবারে নিরাপদ।'

ঠিক তখুনি আমরা লক্ষ্য করলাম পারাটা আরো ওপরে উঠেছে আর ১০৪ ডিগ্রীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওরে দেখ, দেখ! এটা আরো ওপরে উঠেছে!'

আমি বল্‌লাম, 'যেমন করেই হোক আমাদের এটাকে থামাতে হবে।'

—ঠিক কথা, কিন্তু কি করে? যদি এটা কেরসিনের বাতি হতো তাহলে পল্‌তেটা নামিয়ে ফেলা যেত।

—বিদ্যুৎশক্তির তো আর পল্‌তে থাকে না।

চটে উঠে মিশ্‌কা বললো, 'তোর বিদ্যুৎশক্তির ওপর আমার ধারণা খুব উচুঁ হলো না।'

আমিও চটে উঠ্‌লাম। 'আমার বিদ্যুৎশক্তি? বিদ্যুৎশক্তিটা কেন আমার শুনি?'

—ভালো কথা, বিজলি বাতি ব্যবহার করার পরিকল্পনাটা তো তোরই, নয় কি? দেখ, ওটা ১০৮ ডিগ্রীতে পৌঁচেছে! এভাবে চড়তে থাকলে সব ডিমগুলোই সেদ্ধ হয়ে যাবে, ফলে একটাও মুরগিছানা হবে না।

আমি বল্‌লাম, 'এক মিনিট দাঁড়া। বাতিটাকে নীচু করে দেখা যাক। তাহলে এতো তাড়াতাড়ি জল গরম হবে না আর তাপও নেমে আসবে।'

বাতিটার তলা থেকে আমরা সবচেয়ে মোটা বইটা বার করে নিয়ে দেখতে লাগলাম কী হয়। খুব ধীরে ধীরে পারাটা নেমে ১০২ ডিগ্রীতে পৌঁছুলো।

আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এখন সব কিছুই ঠিক আছে। এখুনি আমরা মুরগিছানা ফোটাবার কাজ সুরু করতে পারি। মা-র কাছে আমি কিছু পয়সা চাইছি আর তুইও দৌড়ে বাড়ী গিয়ে তোর মা-র কাছ থেকে কিছু পয়সা চেয়ে নে। আমাদের দুজনের পয়সা দিয়ে দশটা ডিম আমরা কিনবো।'

দৌড়ে আমি বাড়ী গিয়ে ডিম কেনার জন্যে মা-র কাছে পয়সা চাইলাম। মা কিছুতেই বুঝতে পারলেন না ডিমে আমার কী দরকার। আমার বেশ কিছু সময় লাগলো মা-কে বোঝাতে যে আমাদের ইন্‌কুবেটরটার জন্যে ডিমের দরকার।

মা বল্‌লেন, 'ওটা দিয়ে কিছুই হবে না। মুরগি ছাড়া মুরগিবাচ্চা ফোটানো সোজা ব্যাপার নয়। তোরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করবি।'

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি রাজি হলেন আমি ছাড়লাম না।

অবশেষে তিনি বল্‌লেন, 'আচ্ছা বেশ, বেশ। কিন্তু ডিম তোরা কোথা থেকে কিন্‌বি?'

আমি বল্‌লাম, 'দোকান থেকে নিশ্চয়ই। তাছাড়া আর কোথা থেকে?'

মা বল্‌লেন, 'আরে না, না, তাতে হবে না। তোদের দরকার একেবারে তাজা ডিমের, তা নাহলে বাচ্চা ফুটবে না।'

দৌড়ে আমি মিশ্‌কার কাছে গিয়ে সেকথা বল্‌লাম।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমি কী গাধা। ঠিক কথা, বইতেও সেই কথাই লিখছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

গত গ্রীষ্মে শহরের কাছে যে গ্রামে গিয়েছিলাম সেই গ্রামে আমরা যাওয়া ঠিক করলাম। বাড়ীউলি খুড়ি নাতাশা মুরগি পুষতেন। সেখানে নিঃসন্দেহে আমরা তাজা ডিম পাবো।

পরের দিন

জীবনটা ভারি মজার! গতকাল আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি কোথাও যাবো আর এখন আমরা ট্রেনে চেপে চলেছি নাতাশা খুড়ির গ্রামে। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ ডিমগুলো পেতে আর মুরগিছানা ফোটাবার কাজ সুরু করতে। কিন্তু মনে হলো যেন ইচ্ছে করে আমাদের বিরক্ত করার জন্যেই ট্রেনটা গুটিগুটি চলেছে। সেখানে পৌঁছুতে অসম্ভব বেশী সময় লাগলো। আমি লক্ষ্য করেছি সর্বদাই এরকম ঘটে থাকে: যখনই তোমার তাড়াতাড়ি সব কিছুই তখন ইচ্ছে করে ঢিমে তালে চলে। তাছাড়া মিশ্‌কার আর আমার দুর্ভাবনা ছিল হয়তো আমরা যখন পৌঁছব তখন নাতাশা খুড়ি হয়তো বেরিয়ে গেছেন। তখন আমরা কী করবো?

কিন্তু সব কিছুই ভালোয় ভালোয় চুক্‌লো। নাতাশা খুড়ি বাড়ীতে ছিলেন।

আমাদের দেখে তিনি খুব খুসী হলেন। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর কাছে থাকতে আমরা এসেছি।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আপনার কাছে থাকতে পারলে তো খুব খুসীই হতাম। কিন্তু ঠিক এক্ষুনি পারবো না। ছুটীর আগে আর হবে না।'

আমি বল্‌লাম, 'আমরা একটা বিশেষ কারণে এসেছি। আমাদের কিছু ডিমের দরকার।'

নাতাশা খুড়ি বল্‌লেন, 'ব্যাপার কী, শহরে কি ডিম পাওয়া যাচ্ছে না?'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'হ্যাঁ শহরে ডিম আছে। কিন্তু কি হয়েছে জানেন আমাদের তাজা ডিমের দরকার।'

—কিন্তু দোকানে কি তাজা ডিম পাওয়া যায় না?

—মুরগিরা ডিম পাড়লেই সেগুলো দোকানে যায় না, যায় কি?—মিশ্‌কা প্রশ্ন করলো।

—না, তা যায় না বটে।

মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঠিক বলেছেন! যতক্ষণ না অনেকগুলো ডিম জমে ততক্ষণ সেগুলো জমানো হয়। এক সপ্তাহ হয়তো দুসপ্তাহ লেগে যায় সেগুলোকে দোকানে পাঠাতে।'

নাতাশা খুড়ি প্রশ্ন করলেন, 'বেশ, তাতে কী? দুসপ্তাহের মধ্যে ডিম খারাপ হয়ে যায় না।'

—ও, যায় না নাকি! আমাদের বইতে লিখেছে দশ দিনের বেশী পুরোনো ডিম থেকে ছানা ফোটানো যায় না।

নাতাশা খুড়ি বল্‌লেন, 'ও ডিম ফোটানো—তাই বলো! সেটা আলাদা ব্যাপার। তার জন্যে বাস্তবিক তোমাদের সবচেয়ে তাজা ডিমের দরকার। কিন্তু তোমরা যে ডিম খাও সেগুলো এমন কি একমাস দুমাসও ভালো থাকতে পারে। তোমরা নিশ্চয়ই মুরগিছানা পুষতে যাচ্ছো না?'

—হ্যাঁ। সেজন্যেই তো আমরা এখানে এসেছি,—আমি বল্‌লাম।

নাতাশা খুড়ি প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু ডিমগুলোতে তা দেবার ব্যবস্থা কী করবে? তার জন্যে যে মুরগি তা দেয় সেরকম মুরগি দরকার।'

—না, মুরগি ছাড়াই তা দেবার ব্যবস্থা করবো। আমরা একটা ইন্‌কুবেটর বানিয়েছি।

—ইন্‌কুবেটর? অবাক করলে! ইন্‌কুবেটর দিয়ে কী করতে চাও শুনি?

—আমরা ছোট ছোট মুরগিছানা চাই।

—কী জন্যে?

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এই এমনি মজার জন্যে আর কি! মুরগিছানা না থাকলে ভারি একঘেয়ে লাগে। আপনারা গাঁয়ের লোক, আপনাদের সব কিছু আছে—মুরগি, হাঁস, গরু, শূয়োর। কিন্তু আমাদের কিছুই নেই।'

—হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। কিন্তু আমরা যে গ্রামে থাকি। তোমরা তো আর শহরে গরু রাখতে পারো না।

—না, গরু হয়তো নয়, কিন্তু কয়েক ধরণের জীব-জন্তু তো পোষা যায়।

নাতাশা খুড়ি বল্‌লেন, 'না না, শহরে নয়। ভারি ঝামেলা।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমাদের বাড়ীতে এক ভদ্রলোক আছেন, তিনি পাখী পোষেন। তাঁর অনেক খাঁচা, তাতে নানা জাতের পাখী—সিসকিন, ক্যানারি, গোল্‌ডফিঞ্চ এমন কি স্টার্লিঙও।'

—হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু তিনি তো তাদের খাঁচায় রাখেন। তোমরা তো আর মুরগিছানাগুলোকে খাঁচায় রাখতে যাচ্ছো না?

—না, আমরা সেগুলোকে রান্নাঘরে রাখবো। কিছু ভাব্‌বেন না, তাদের জন্যে আমরা ভালো জায়গা খুঁজে বের করবো। শুধু সবচেয়ে ভালো যে ডিম পাওয়া যায় সেগুলো আমাদের দাও—সবচেয়ে সবচেয়ে তাজা। নইলে সেগুলো থেকে বাচ্চা ফোটানো যাবে না।

নাতাশা খুড়ি বল্‌লেন, 'বেশ, তাই হবে। সেরকম ডিমই তোমাদের দেব। কী রকম ডিম তোমাদের দরকার আমি বুঝতে পেরেছি। সেগুলো যতটা সম্ভব তাজা হবে।'

নাতাশা খুড়ি রান্নাঘর থেকে ঘুরে এলেন পনেরোটি সুন্দর ডিম নিয়ে। প্রত্যেকটিই মসৃণ ও তাজা, কোনটিতেই এক ফোঁটা দাগ নেই। যে কেউ দেখলেই বুঝবে সেগুলো তাজা। সেগুলোকে তিনি আমাদের ঝুড়িতে ভরে পশমের শাল দিয়ে মুড়ে দিলেন যাতে পথে সেগুলো ঠাণ্ডা হয়ে না যায়।

আমাদের ফটকের কাছে বিদায় দেবার সময় নাতাশা খুড়ি বল্‌লেন, 'তবে তোমরা এসো, তোমরা যেন সফল হও।'

বাইরে তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। মিশ্‌কা আর আমি স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম।

যখন আমরা বাড়ী পৌঁছুলাম তখন খুব দেরী হয়ে গেছে। মা আমাকে খুব বকলেন। মিশ্‌কাও তার মা-র কাছ থেকে খুব বকুনি খেলো। কিন্তু তাতে আমরা কিছু মনে করলাম না! শুধু মনে হতে লাগলো এতো দেরী হয়ে গেছে যে সে রাত্রে আমরা আর মুরগিছানা ফোটাবার কাজ সুরু করতে পারবো না। পরের দিনের জন্যে সে কাজ তুলে রাখতে হলো।

আরম্ভ

পরের দিন স্কুল থেকে ফিরেই ডিমগুলোকে আমরা ইন্‌কুবেটরের মধ্যে রাখলাম। সেগুলোকে রাখবার জন্যে প্রচুর জায়গা ছিল এমন কি কিছু বাড়তি জায়গাও।

ইন্‌কুবেটরের ওপর ঢাক্‌নাটা চড়িয়ে ফুটোর মধ্যে থারমোমিটারটা ঢুকিয়ে যখন সুইচ টিপে বাতি জ্বালাতে যাচ্ছি মিশ্‌কা তখন বল্‌লো:

—প্রথমে দেখে নেওয়া যাক আমরা সব কিছু ঠিক করেছি কি না। হয়তো প্রথমে ইন্‌কুবেটরটাকে গরম করার পর ডিমগুলো রাখা দরকার।

আমি বল্‌লাম, 'তা তো আমি জানি না। বইতে কী লেখা আছে দেখা যাক।'

বইটা বার করে মিশ্‌কা পড়তে লাগলো। অনেকক্ষণ পড়ে সে বল্‌লো:

—তুই বোধ হয় জানিস না ওগুলোকে আমরা প্রায় দম বন্ধ করে মেরেছিলাম!

—কাদের দম বন্ধ করেছিলাম?

—ডিমগুলোকে। বই পড়ে দেখছি সেগুলো এখনো জীবন্ত আছে।

বিস্মিত হতে আমি বল্‌লাম, 'জীবন্ত?'

—হ্যাঁ। বইটার এখানে লিখছে: 'ডিমগুলোয় প্রাণ আছে, যদিও তা স্পষ্টত দেখা যায় না। সে প্রাণ এখনো গুপ্ত আছে। কিন্তু ডিমগুলো যখন গরম হয়ে ওঠে প্রাণের স্পন্দন তখন দেখা যায় এবং ক্রমশ ভ্রূণটি বড় হয়ে শেষে পাখীর ছানার জন্ম দেয়। সব রকম প্রাণীর মতনই ডিমগুলো নিশ্বেস নেয়…' শুন্‌লি তো? ঠিক তোর আর আমার মতনই ডিমগুলোও নিশ্বেস নেয়।

আমি বল্‌লাম, 'ওরে বোকা, তুই আর আমি তো মুখ দিয়ে নিশ্বেস নিই। কিন্তু ডিমগুলো, কী দিয়ে নিশ্বেস নেয়?'

—আমরা মুখ দিয়ে নিশ্বেস নিই না, ফুস্‌ফুস দিয়ে নিই। মুখের মধ্যে দিয়ে ফুস্‌ফুসের মধ্যে হাওয়া ঢোকে, কিন্তু ডিমগুলো নিশ্বেস নেয় খোলার ভেতর দিয়ে। খোলার ভেতর দিয়েই বাতাস বয় আর সেভাবেই তারা নিশ্বেস নেয়।

আমি বল্‌লাম, 'ভালো কথা, যত খুসী তারা নিশ্বেস নিক। আমরা কি তাদের বারণ করছি?'

—কিন্তু বাক্সের মধ্যে তারা কি করে নিশ্বেস নিতে পারে? নিশ্বেস ছাড়বার সময় কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস আমরা ছাড়ি। যদি তোকে কোনো একটা বাক্সয় বন্ধ করে রাখা যায় তাহলে এতো কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস ছাড়বি যে অল্পক্ষণের মধ্যেই দম বন্ধ হয়ে মরবি।

—বাক্সের মধ্যে কেন আমি বন্ধ হতে যাবো? আমি তো দম বন্ধ হয়ে মরতে চাই না!—আমি বল্‌লাম।

—ডিমগুলোও তা চায় না। এদিকে আমরা সেগুলোকে একটা বাক্সের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছি।

—তাহলে আমরা এখন কী করবো?

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'বাতাস চলাচলের পথ এখন করা দরকার। সত্যিকারের সব ইন্‌কুবেটরেই বাতাস চলাচলের পথ আছে।'

বাক্স থেকে আমরা সমস্ত ডিমগুলো বার করে নিলাম, নজর রাখলাম যাতে সেগুলো না ভাঙে। তারপর সেগুলোকে ঝুড়িতে রাখলাম। মিশ্‌কা ড্রিল* নিয়ে এসে ইন্‌কুবেটরের গায়ে কতকগুলো ছোট ছোট ফুটো করলো যাতে কার্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারে।

ফুটো করা হয়ে যাবার পর বাক্সের মধ্যে ডিমগুলো রেখে ঢাকা লাগিয়ে দিলাম।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এক মিনিট শোন। প্রথমে কী করতে হবে আমরা এখনো জানি না—ইন্‌কুবেটরটা আগে গরম করতে হয় না ডিমগুলো আগে রাখতে হয়।'

আবার সে বইটা দেখলো। কিছু পরে সে বল্‌লো, 'আবার আমরা ভুল করেছি। এখানে লিখছে ইন্‌কুবেটরের মধ্যে বাতাস যেন ভিজে থাকে, কারণ বাতাস শুখ্‌নো থাকলে ডিমের ভেতরকার তরল অংশ খোলার ভেতর দিয়ে উড়ে যাবে আর ভ্রূণটা যাবে মারা। ইন্‌কুবেটরের মধ্যে গাম্‌লা করে জল রাখা দরকার। সেই জল উপে গিয়ে বাতাসকে জোলো করবে।'

তাই আমরা আবার সমস্ত ডিমগুলো বার করলাম। দু'গেলাশ জল আমরা ভেতরে রাখতে চেষ্টা করলাম কিন্তু গেলাশগুলো বড় উঁচু বলে ঢাক্‌না বন্ধ হলো না। ছোট

---

* ড্রিল—ফুটো করার একটা যন্ত্র।

কিছুর জন্যে আমরা এদিক ওদিক খুঁজলাম কিন্তু কিছুই পেলাম না। মিশ্‌কার তখন মনে পড়লো তার ছোট্ট বোন মায়ার কতকগুলো খেলবার কাঠের বাটি আছে।

সে বল্‌লো, 'মায়ার কয়েকটা বাটি আন্‌লে কেমন হয়?'

আমি বল্‌লাম, 'খুব ভালো কথা! গিয়ে কয়েকটা নিয়ে আয়!'

মিশ্‌কা মায়ার রেকাবগুলো খুঁজে বার করে তার থেকে চারটে কাঠের বাটি নিয়ে এলো। দেখা গেল সেগুলো ঠিক মাপের হয়েছে। সেগুলোতে জল ভরে ইন্‌কুবেটরের মধ্যে এক এক কোণে এক একটা করে রাখলাম। কিন্তু যখন আবার আমরা ডিমগুলো ভেতরে রাখতে গেলাম দেখলাম মাত্র বারোটা ডিম রাখার জায়গা আছে। তিনটে ডিম বাড়তি হলো।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এতে কিছু যায় আসে না। বারোটা মুরগিছানাই যথেষ্ট। আর বেশী নিয়ে আমরা কী করবো? এখন যা আছে তাদের সবাইকার জন্যে আমাদের অনেক খাবার জোগাড় করতে হবে।'

ঠিক সেই সময় মায়া এসে হাজির হোলো আর যখন সে দেখলো তার বাটিগুলো ইন্‌কুবেটরের মধ্যে রাখা হয়েছে সে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

আমি বল্‌লাম, 'শোন্ শোন্, আমরা এগুলো একেবারে নিয়ে নিচ্ছি না। এখন থেকে একুশ দিন পরে তুই এগুলো ফেরৎ পাবি। তুই যদি চাস তো ওগুলোর বদলে এখুনি তিনটে ডিম দিতে পারি।'

—ডিম নিয়ে আমি কী করবো? ওগুলো তো খালি।

—না না, ওগুলো খালি নয়। ওগুলোর মধ্যে কুসুম আর সাদা সাদা জিনিস সব কিছুই আছে।

—কিন্তু ওগুলোর মধ্যে তো আর মুরগিছানা নেই!

—যখন মুরগিছানা ফুটে বেরুবে তখন তোকে একটা আমরা দেবো।

—সত্যি বলছো তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন কিন্তু এখান থেকে পালা, আমাদের আর বিরক্ত করিস না। এমনিতেই এখন আমাদের হ্যাঙ্গামার শেষ নেই, কি করে স্থরু করবো এই ভাবনা নিয়ে। আমরা জানি না আগে ডিমগুলো রেখে ইন্‌কুবেটরটাকে গরম করতে হবে নাকি আগে সেটা গরম করে পরে ডিমগুলো রাখতে হবে।

মিশ্‌কা আবার বইটা পড়ে দেখে বার করলো যে দু'ভাবেই করা যায়।

আমি বল্‌লাম, 'ভালো কথা। স্থইচ টিপে বিজলি বাতি জ্বালিয়ে স্থরু করা যাক।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমার কিন্তু অল্প অল্প ভয় হচ্ছে। তুই বরং স্থইচ টিপে আলোটা জ্বালা, আমার কপাল ভারি খারাপ।'

—কেন ও কথা ভাবছিস?

—আমার কপাল খারাপ, ব্যস। আমি যা করি কিছুই কখনো সফল হয় না।

আমি বল্‌লাম, 'আমার বেলাতেও তাই। আমারও কপাল সব সময় খারাপ যায়।'

আমরা দু'জনেই আমাদের জীবনে নানা ঘটনার কথা ভাবতে লাগলাম, আর দেখা গেল আমাদের দু'জনেরই কপাল ভারি খারাপ।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমাদের দু'জনের কারুরই এ ধরণের কাজ স্থরু করা উচিত নয়। করলে নিশ্চয়ই বিফল হবো।'

আমি বল্‌লাম, 'মায়াকে অনুরোধ করা যাক।'

মিশ্‌কা তার বোনকে ডেকে আন্‌লো।

আমি বল্‌লাম, 'শোন মায়া, তোর কপাল কি ভালো?'

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

—জীবনে তুই কি কখনো বিফল হয়েছিস?

—কক্ষণো না।

—ভালো কথা! বাক্সের মধ্যে ঐ বাতিটা দেখতে পাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

—তারের প্লাগটা লাগিয়ে দে।

মায়া ইন্‌কুবেটরের কাছে গিয়ে তারের প্লাগটা লাগিয়ে দিল।

সে প্রশ্ন করলো, 'আর কি করতে হবে?'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আর কিছু নয়। এখন পালা আমাদের আর বিরক্ত করিস না।'

মায়া তর্জন গর্জন করতে করতে চলে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি ঢাক্‌নাটা লাগিয়ে থারমোমিটারের ওপর নজর রাখতে লাগলাম। প্রথমে পারাটা ৬৪টি ডিগ্রীতে গিয়ে দাঁড়ালো কিন্তু পরে ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগলো যতক্ষণ না সেটা ৬৮ ডিগ্রীতে পোঁছুল। তারপর কিছু তাড়াতাড়ি সেটা ৭৭ ডিগ্রীতে পোঁছুল আর যখন ৮৬ ডিগ্রীতে এলো তার গতি মন্থর হলো। আধঘণ্টার মধ্যে সেটা ৯৫ ডিগ্রীতে পোঁছুল আর তারপর গেল থেমে। আমি আর একটা বই বাতিটার তলায় গুঁজে দিলাম আর পারাটাও আবার ওপরে উঠতে লাগলো। সেটা ১০২ ডিগ্রীতে পোঁছুল এবং আরো উঠতে লাগলো।

মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো, 'থাম থাম! দ্যাখ দ্যাখ, ওটা ১০৪-এ পোঁচেছে। বইটা বড্ড বেশী মোটা।'

সে বইটা বার করে আমি একটা পাতলা বই গুঁজলাম। পারাটা নামতে আরম্ভ করলো। সেটা ১০২ ডিগ্রীতে নেমে এলো এবং আরো নীচে নামতে লাগলো।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'ওটা বেশী পাতলা। দাঁড়া, আমি একটা খাতা নিয়ে আসছি।'

দৌড়ে খাতাটা এনে সে বাতিটার তলায় গুঁজলো। পারাটা আবার উঠতে লাগলো, তারপর আবার ১০২ ডিগ্রীতে পোঁছে থেমে গেল। থারমোমিটারের ওপর আমরা ঠায় নজর রাখলাম। পারাটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ফিস্‌ফিস করে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'একুশ দিন ধরে সমান তাপ আমাদের রাখতে হবে। তুই কি মনে করিস আমরা পারবো?'

আমি বল্‌লাম, 'নিশ্চয়ই পারবো।'

—কারণ না পারলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

—নিশ্চয়ই এটা আমরা পারবো। কে বলে আমরা পারবো না!

সমস্ত দিন ধরে আমরা ইন্‌কুবেটরটার পাশে বসে রইলাম। এমন কি রান্নাঘরে

বসেই থারমোমিটারের ওপর নজর রেখে আমরা পড়াশুনো করলাম। পারাটা ১০২ ডিগ্রীতে দাঁড়িয়ে রইলো।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'সব কিছুই ভালো চলেছে। আমরা যদি এভাবে চলি তাহলে ঠিকু একুশ দিন পরে আমাদের মুরগিছানাগুলো পাবো। ভেবে দেখ একবার, বারোটা নরম রোঁয়াওলা ছোট্ট ছোট্ট মুরগিছানা? কী আমুদে পরিবারই না তাদের হবে!'

তাপ নামতে আরম্ভ করলো

অন্য ছেলেদের কথা জানি না, কিন্তু আমি রবিবারে অনেকক্ষণ ঘুমতে ভালোবাসি। রবিবারে স্কুলে কিম্বা তাড়াহুড়ো করে অন্য কোথাও যেতে হয় না। সপ্তাহে একদিন যে কেউ বিছানায় গড়াতে পারে। আমাকে যদি জিগ্‌গেস করো বল্‌বো এটা কিছু অন্যায় নয়। হবি তো হ, পরের দিনটা ছিল রবিবার কিন্তু কি জানি কেন খুব সকালেই আমার ঘুম ভাঙলো। তখনো সূর্য ওঠেনি বটে কিন্তু আলো এসে গেছে। পাশ ফিরে আবার আমি ঘুমতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ঠিক তখনোই ইন্‌কুবেটরটার কথা আমার মনে পড়লো। একলাফে বিছানা ছেড়ে, তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে মিশ্‌কার বাড়ীর দিকে দৌড়োলাম। মিশ্‌কা নিজেই দরজা খুলে দিলো।

সে ফিস্‌ফিস করে বল্‌লো, 'শ্‌-শ্‌-শ্‌, তুই সব্বাইকে জাগিয়ে তুলবি। এতো সকালে এখানে আসার কি দরকার ছিল। এমন ভাবে ঘণ্টা বাজাচ্ছিলি যেন বাড়ীতে আগুন লেগেছে!'

পরনে তার শোবার শার্ট আর পা-দুটো খালি।

আমি বল্‌লাম, 'কিন্তু তুইও তো উঠে পড়েছিস, উঠিসনি কি?'

মিশ্‌কা গজরে উঠলো, 'উঠে পড়া! এখনো তো বিছানাতে শুতেই যাইনি।'

—কেন যাসনি?

—ঐ হতচ্ছাড়া ইন্‌কুবেটরটার জন্যে, আর কেন।

—কিছু হয়েছে নাকি?

—কেবল পড়ছে।

—কিন্তু কেন সেটা পড়বে? গতকাল তো সেটা বেশ মজবুত অবস্থায় ছিল।

—আরে বোকা, ইন্‌কুবেটরটা নয়! আমি তাপের কথা বলছিলাম।

—সেটাই বা পড়বে কেন?

—আমিও তো সেকথাই জানতে চাই। যখন আমি শুতে গিয়েছিলাম তখন পর্যন্ত সব কিছু ঠিক ছিল কিন্তু মুরগিছানাদের কথা ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ আমার ঘুম আসেনি। খানিক পরে ইন্‌কুবেটরটা কি রকম কাজ করছে দেখার জন্যে আমি উঠেছিলাম। এক দৌড়ে রান্নাঘরে গেলাম আর জানিস—দেখি থারমোমিটারটা ১০১ ডিগ্রীতে নেমে গেছে! তক্ষুনি আমি আর একটা খাতা বাতিটার তলার গুঁজে দিলাম আর যতক্ষণ না তাপ ১০২ ডিগ্রীতে পৌঁছুল ততক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমার ঘুম না আসায় ভালোই হয়েছিল না হলে আমাদের মুরগিছানাগুলোর দফারফা হতো। শুতে না গিয়ে আমি ঠিক করলাম দেখি কী হয়। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। একঘণ্টা গেল, দুঘণ্টা গেল, কিন্তু তাপের কোনো পরিবর্তন হলো না। কিন্তু কিছু না করে বসে থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তাই একটা বই নিয়ে আমি পড়তে সুরু করলাম। কিন্তু গল্পটায় এমন জমে গেলাম যে থারমোমিটারটার কথা একেবারেই গেলাম ভুলে। আর যখন আমি চোখ তুলে তাকালাম, দেখলাম আবার ১০১ ডিগ্রীতে নেমে গেছে। থারমোমিটারটা এক ডিগ্রী গেছে নেমে। আর একটা লেখার খাতা বাতিটার তলায় গুঁজে দিলাম আর তাপটা আবার সমান হলো। জানিস, এখনো সমানভাবে রয়েছে কিন্তু পরে কী হবে কেউ জানে না।

আমি বল্‌লাম, 'তুই বরং এখন শুতে যা। আমি এখানে থেকে খানিক পাহারা দিই।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এখন শুতে গিয়ে লাভ কী? এখন তো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

পা টিপে টিপে নিজের ঘরে গিয়ে জামাকাপড়গুলো এনে সে পরতে লাগলো। শার্ট আর প্যাণ্ট পরে জুতোয় ফিতে এঁটে সোফায় শুয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ভাবলাম, 'ওকে আর জাগাবো না। মাঝে মাঝে সবাইকারই ঘুমের দরকার।'

আমি ইন্‌কুবেটরটার পাশে বসে থারমোমিটারটার উপর নজর রাখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরেই কিছু করার না থাকায় আমার বিরক্ত ধরে গেল। তাই মুরগি-চাষের বইটা বার করে ইন্‌কবেটরটা নজর রাখার সম্বন্ধে যেটুকু আছে সেটুকু পড়ে ফেল্‌লাম। বইতে লেখা আছে ডিমগুলো যদি একই জায়গায় থাকে তাহলে ভেতরের দিকে খোলার গায়ে ভ্রূণটা আটকে যেতে পারে, ফলে মুরগিছানাগুলো বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হয়ে যায় কিম্বা ভারি দুর্বল হয়ে পড়ে। যাতে ভ্রূণ খোলার গায়ে আটকে না যায় তার জন্যে তিন ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া ডিমগুলো ওল্টানো দরকার।

তাড়াতাড়ি করে ইন্‌কুবেটরটা খুলে আমি ডিমগুলো ওল্টাতে লাগলাম। ঠিক তখনি মিশ্‌কা জেগে উঠলো। যখন দেখলো আমি ইন্‌কুবেটরটা খুলেছি তখন সে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলো:

—তুই আবার কী করছিস।

আমি এমন চম্‌কে উঠলাম যে আর একটু হলেই একটা ডিম হাত থেকে পড়ে যেত।

—কিছু নয়,—আমি বল্‌লাম।

—'কিছু নয়' মানে কী? ইন্‌কুবেটরটা খুলেছিস কেন? তোকে বলিনি কি যে আমাদের একুশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। মনে হচ্ছে তোর ধারণা যে একদিনের মধ্যেই বাচ্চা ফুটিয়ে বার করা যায়।

আমি বল্‌লাম, 'ও ধরণের আমি কিছু ভাবিনি।' তাকে আমি বোঝাতে চেষ্ট করলাম ডিমগুলোকে তিন ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া ওল্টাবার কথা।

কিন্তু সে কোনো কথা শুন্‌লো না। গলা ফাটিয়ে শুধু চেঁচাতে লাগলো:

—ঢাকাটা চাপা দে! চাপা দে বলছি! এক মিনিটের জন্যেও ঘুমবার যো নেই। আমি চোখ বুঁজেছি কি তুই অমনি গিয়ে ইন্‌কুবেটরটা খুলেছিস।

আমি বললাম, 'আমি ওগুলোর দিকে দেখছিলামই না।'

সে দৌড়ে গিয়ে ঢাকাটা লাগিয়ে দিলো, কিন্তু তার মধ্যে আমি ডিমগুলোকে উল্টে দিয়েছি। মিশ্‌কা এমন চেঁচাতে লাগলো যে তার বাবা আর মা দৌড়ে এলেন।

তাঁরা প্রশ্ন করলেন, 'এতো গোলমাল কিসের?'

মিশ্কা বল্লো, 'এ গাধাটা গিয়ে ইন্কুবেটরটা খুলে ফেলেছে।'

আমি বোঝাতে গেলাম ডিমগুলোকে ওল্টানো দরকার, নাহলে মুরগিছানাগুলো বিকলাঙ্গ অবস্থায় বেরিয়ে আসবে।

মিশ্কা বল্লো, 'কে বললো? মুরগিগুলো কেন তা দিয়ে তাহলে বিকলাঙ্গ ছানা ফোটায় না?'

মিশ্কার মা বল্লেন, 'মুরগিগুলো তা দিতে দিতে সব সময়ই ডিমগুলো ওল্টায়।'

মিশ্কা বল্লো, 'বোকা মুরগিরা কি করে জানে যে ডিমগুলো ওল্টাতে হবে?'

তার মা উত্তর দিলেন, 'তুই যত ভাবিস তারা তত বোকা নয়।'

মিশ্কা কয়েক মুহূর্ত ভাবলো।

অবশেষে সে বললো, 'হ্যাঁ, এখন আমার মনে পড়ছে, আমি তো নিজেই তাদের দেখেছি ডিমগুলো ওল্টাতে। আমি সব সময় ভাবতাম তারা কেন তাদের নাক দিয়ে ডিমগুলোকে ক্রমাগত খোঁচা দেয়।'

মিশ্কার বাবা হেসে উঠলেন।

—বোকা ছেলে,—তিনি বল্লেন।—তুই আবার কখন দেখলি নাকওলা মুরগি?

—আমি ঠোঁট বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঠোঁটগুলো তো মুরগিদের নাকই।

তাপ বাড়তে আরম্ভ করলো

প্রায় দশটার সময় কী জানি কী কারণে থারমোমিটারের মধ্যেকার পারাটা এক ডিগ্রী উঠে পড়লো। ফলে একটা খাতা বার করে নিয়ে আলোটাকে নামাতে হলো।

হতবুদ্ধি হয়ে মিশ্কা বল্লো, 'আমি তো কিছুই বুঝছি না। সমস্ত রাত ধরে ক্রমাগত তাপ নামছিল, কিন্তু এখন আবার সেটা উঠছে। এ তো অদ্ভুত।'

দুপরের খাবার আগে আবার আমাদের বাতিটাকে নামাতে হলো কারণ তাপ উঠেই চলছিল।

খেয়ে দেয়ে মিশ্‌কা সোফাটার ওপর টান হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। শুধু আমি জেগে বসে থাকায় ভারি একলা লাগতে লাগলো। তাই আমার আঁকবার খাতাটা এনে মিশ্‌কার ঘুমন্ত চেহারার ছবি আঁকলাম। মানুষরা যখন ঘুময় তখন তাদের ছবি আঁকা সহজ কারণ তখন তারা স্থির হয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে কোস্তিয়া দেভিয়াৎকিন এলো। মিশ্‌কাকে ঘুমতে দেখে সে বল্‌লো:

—ওর হয়েছে কী. ঘুমের অসুখ?

আমি বল্‌লাম, 'না, ও শুধু একটু গড়িয়ে নিচ্ছে।'

এগিয়ে গিয়ে কোস্তয়া মিশ্‌কার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিলো।

—এই, ওঠবার সময় হয়েছে!

লাফিয়ে উঠলো মিশ্‌কা।

—আরে কী ব্যাপার? সকাল হয়ে গেছে নাকি?

হেসে কোস্তিয়া বল্‌লো. 'সকাল! একটু পরেই সন্ধে হবে। উঠে পড়, বাইরে খেলতে আয়। চেয়ে দ্যাখ সূর্য জ্বলজ্বল করছে আর পাখীরা ডাকছে। এখন বসন্তকাল!'

—আমাদের খেলবার সময় নেই। আমাদের অনেক কাজ আছে!—মিশ্‌কা বল্‌লো।

—কাজ আবার কী?

—ভারি দরকারী কাজ।

মিশ্‌কা ইন্‌কুবেটরের কাছে গেল থারমোমিটারের দিকে তাকালো তারপর আর্তনাদ করে উঠলো:

—তুই করছিস কী! বাজারের ছাগলের মতো ওখানে বসে বসে? চেয়ে দেখ কী হয়েছে!

—আমি থারমোমিটারটার দিকে তাকালাম। আবার তাতে ১০৩ ডিগ্রী উঠেছে।

চটপট মিশ্‌কা বাতিটা নামিয়ে আনলো।

রেগে সে বল্‌লো, 'বাজি ফেলে আমি বল্‌তে পারি আমি না জেগে উঠলে তুই এটাকে ১০৪ ডিগ্রীতে উঠতে দিতিস।'

আমি বল্‌লাম, 'তুই যদি সব সময় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নাক ডাকাস সেটা তো আর আমার দোষ নয়।'

—সমস্ত রাত যে ঘুময়ইনি সেটা কি আমার দোষ?

আমি বল্‌লাম, 'সেটা আমার দোষও তো নয়।'

কোস্তিয়া ইন্‌কুবেটরটা দেখলো।

—ওটা আবার কী? আর একটা স্টিম-ইঞ্জিন?—সে প্রশ্ন করলো।

—বোকার মত কথা বলিস না, ওটাকে কি স্টিম-ইঞ্জিনের মত দেখাচ্ছে?

—তাহলে ওটা কী?

—ভেবে বল কী!

কোস্তিয়া মাথা চুলকিয়ে বল্‌লো, 'হুম! নিশ্চয়ই ওটা স্টিম-টারবাইন।'

—ভুল। আবার চেষ্টা কর।

—আচ্ছা, বেশ আবার বলছি। একজাতের জেট-ইঞ্জিন।

মিশ্‌কা আর আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম।

—একশো বছর ধরে ভাবলেও এটা কী তুই বলতে পারবি না!

—তাহলে কী এটা?

—একটা ইন্‌কুবেটর।

—ওহো, একটা ইন্‌কুবেটর। বুঝছি। এটা দিয়ে কী হবে?

—তুই জানিস না ইন্‌কুবেটর দিয়ে কী হয়?—মিশ্‌কা বল্‌লো।—এটা দিয়ে মুরগিছানা ফোটানো যায়।

—ও, বুঝছি, বুঝছি, কিন্তু কিসের থেকে মুরগিছানা ওটা ফোটায়?

বিরক্ত হয়ে মিশ্‌কা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো। 'ডিম থেকে নিশ্চয়ই ক্যাবলা কোথাকার।'

—ও, ডিম! নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এটা থাকলে মুরগির আর দরকার হয় না। আমি এটার কথা সবই জানি। আমার কেবল মনে হচ্ছিল এটার নাম বুঝি হেনকুপাতের··· আর ডিমগুলো কোথায়?

—এই যে এইখানে, বাক্সের মধ্যে।

—দেখি দেখি।

—সেটি হবার নয়। সবাইকেই যদি দেখাতে হয় তাহলে আমাদের মুরগিছানা কখনোই হবে না। ইচ্ছে হলে অপেক্ষা কর, যখন আমরা ডিমগুলো উল্টোবো তখন দেখতে পাবি।

—সেটা কখন হবে?

মিশ্‌কা আর আমি তাড়াতাড়ি হিসেব করে দেখলাম যে আবার আটটার সময় ডিমগুলোকে উল্টোতে হবে।

কোস্তিয়া বল্‌লো সে অপেক্ষা করবে। তাই মিশ্‌কা তার দাবা খেলার ছক এনে হাজির করলো আর আমরা সবাই খেলতে বসলাম। সত্যি কথা বলতে কি তিনজনে মিলে দাবা খেলায় কোনো মজা নেই। কারণ দুজনে মাত্র খেলতে পারে আর তৃতীয় জন শুধু জোগাতে পারে বুদ্ধি। আর তাতে ভালো কিছু হয় না। যদি তুমি জেতো তাহলে লোকে বলবে তোমাকে সাহায্য করা হয়েছে বলেই জিতেছো। আর যদি তুমি হারো সবাই তোমার দিকে চেয়ে হাসবে আর বলবে এমন কি অন্য লোকে দেখিয়ে দিলো তবুও তুমি খেলতে পারো না। দাবা এমন একটা খেলা যেটা শুধু দুজনে মিলে খেলতে হয়, আর কারো মধ্যস্থতা না নিয়ে।

অবশেষে ঘড়িতে আটটা বাজলো। মিশ্‌কা ইন্‌কুবেটরটা খুলে ডিমগুলো উল্টোতে লাগলো আর কোস্তিয়া তার পাশে দাঁড়িয়ে লাগলো গুণতে।

সে গুণতে লাগলো, 'দশ, এগারো। এগারোটা ডিম। তাহলে তাদের এগারোটা মুরগিছানা হবে?'

বিস্মিত হয়ে মিশ্‌কা প্রতিধ্বনি করলো, 'এগারোটা? তুই ভুল করছিস। বারোটা ডিম ছিল। চুলোয় যাক, কেউ নিশ্চয়ই একটা ডিম চুরি করেছে। কী লজ্জার কথা! দেখছি স্বস্তিতে কেউ ঘুমতে পারবে না, তাহলেই ডিম চুরি যাবে।

তুই কী করছিলি?' সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। 'কথা ছিল তই পাহারা দিবি!'

—তাই তো দিচ্ছিলাম। সর্বক্ষণই তো এখানে ছিলাম। আবার গোণা যাক। কোস্তিয়া নিশ্চয়ই একটা ভুল করেছে।

মিশ্‌কা আবার গুণে দেখলো তেরোটা ডিমই আছে।

সে গজরে উঠলো, 'চেয়ে দেখ, এখন একটা বেশীই রয়েছে। কে সেটাকে রাখলো?'

তারপর আমি আবার গুণলাম এবং দেখলাম ঠিক বারোটাই রয়েছে।

—গুণিয়ে লোক বটে!—আমি বল্‌লাম।—মাত্র বারো পর্যন্ত গুণতে পারে না।

—ও মা,—মিশ্‌কা আর্তস্বরে বল্‌লো।—আমার এখন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। একটা ডিমকে উল্টোবার কথা ছিল কিন্তু এখন আমি মনে করতে পারছি না সেটা কোনটা।

মিশ্‌কা যখন মনে করতে চেষ্টা করছিল ঠিক সেসময়ই মায়া দৌড়ে ঘরে এলো। সোজা ইন্‌কুবেটরের কাছে এসে সবচেয়ে বড় ডিমটাকে দেখিয়ে সে বল্‌লো:

—আমার মুরগিছানাটা ওটার মধ্যে রয়েছে।

মিশ্‌কা আর আমি রেগে উঠে তাকে ঘর থেকে ঠেলে বার করে দিলাম।

—আবার যদি তুই এখানে এসে আমাদের বিরক্ত করিস তাহলে একটাও মুরগিছানা পাবি না বলছি।

মায়া কাঁদতে আরম্ভ করলো।

—তোমরা আমার বাটিগুলো নিয়েছো। আমার যতক্ষণ খুসী ততক্ষণ দেখবো। আমার অধিকার আছে!

তাকে বার করে শক্তভাবে দরজা বন্ধ করে মিশ্‌কা বললো, 'ও তাই নাকি? তোর অধিকার? আচ্ছা সে কথা দেখা যাবে!'

আমি বল্‌লাম, 'এখন আমরা কী করবো? আবার কি আমাদের ডিমগুলো উল্টোতে হবে?'

—না না, না করাই ভালো, উল্টোতে গেলে হয়তো যেদিকে সেগুলো ছিল সেদিকেই আমরা ফিরিয়ে আন্‌বো। ওগুলো যেরকম ছিল সেরকমই থাক। পরের বার আমরা আরো সাবধান হবো।

কোস্তিয়া বল্‌লো, 'ডিমগুলোর ওপর একটা করে দাগ দেওয়া যাক। যাতে তোমরা বুঝতে পারো কোনগুলো উল্টানো হয়েছে কোনগুলো হয়নি।'

মিশ্‌কা প্রশ্ন করলো, 'তা কি করে হবে?'

—ওগুলোর ওপর একটা করে ক্রুশ চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে।

—না না, আমি ওগুলোয় নম্বর দেবো।

মিশ্‌কা একটা পেন্সিল বার করে সব ডিমগুলোর ওপর এক থেকে বারো পর্যন্ত লিখে গেল।

—পরের বার আমরা যখন ডিমগুলো উল্টোবো তখন নম্বরগুলো সব তলায় চলে যাবে, আর তারপর নম্বরগুলো সব আসবে ওপরে। এতে আর কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা নেই,—এই কথা বলে মিশ্‌কা ইন্‌কবেটরটাকে বন্ধ করলো।

কোস্তিয়ার যাবার সময় মিশ্‌কা বল্‌লো:

—স্কুলে কিন্তু কাউকে বলবি না আমাদের ইন্‌কুবেটরের কথা।

—কেন নয়?

—ও, তা আমি জানি না… তারা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি সুরু করবে।

—তারা হাসবে কেন? ইন্‌কুবেটর তো খুব দরকারী জিনিস।

—আরে তুই তো জানিস ছেলেরা কি ধাঁচের, তারা হয়তো বলবে যে আমরা তা দেওয়া মুরগি জাতের। আর ধর হয়তো আমরা বিফল হলাম। তাহলে তো হাসি ঠাট্টা শোনার শেষ থাকবে না।

—কিন্তু এটা বিফল হবে কেন?

—সবই হতে পারে। তুই যেরকম সহজ ভাবছিস সেরকম নয়। হয়তো আমরা সবই ভুল করছি। তাই কিছু না বলাই ভালো।

কোস্তিয়া বল্‌লো, 'ভালো কথা। আমি একেবারে বোবা বনে যাবো।'

মায়ার পাহারা দেওয়া

পরের সকালে মিশ্‌কার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি প্রশ্ন করলাম, 'খবর কী?'

—খুব ভালো, শুধু কেবল তাপটা আবার সমস্ত রাত ধরে ক্রমাগত নেমে যাচ্ছিল।

—তুই কি বলতে চাস গতকালও তুই ঘুমসনি?

—না না, আমি এখন অনেক চালাক হয়ে উঠেছি। এ্যালার্ম ঘড়িটাকে মাথার বালিশের তলায় রেখেছিলাম আর তিন ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া সেটা আমায় জাগিয়েছিল।

—কিন্তু তাপটা নামছিল কেন? সমস্ত দিন তো উঠছিল,—আমি বল্‌লাম।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমি জানি কেন। রাতগুলো ঠাণ্ডা, তাই তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায় কিন্তু দিনগুলো গরম। সে কারণেই দিনের বেলায় তাপ ওঠে আর রাত্রে তাপ নামে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে আমরা কী ব্যবস্থা করবো? আমরা যখন স্কুলে থাকবো কে তখন তাপের দিকে নজর রাখবে?'

—মায়া রাখতে পারে বোধ হয়। তাকে জিগ্‌গেস করা যাক।

মায়াকে ডেকে মিশ্‌কা জিগ্‌গেস করলো আমরা যখন স্কুলে থাকবো তখন সে ইন্‌কুবেটরটার দিকে নজর রাখতে পারবে কি না।

মায়া বল্‌লো, 'না, আমি পারবো না। গতকাল তোমরা আমায় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে আর এখন বলছো তোমাদের সাহায্য করতে।'

আমি বল্‌লাম, 'শোন্‌, তুই কি চাস যে মুরগিছানাগুলো মরুক? কারণ এখন থেকে তাদের যত্ন না নিলে তারা মরবে, তোর মুরগিছানাটা শুদ্ধু। আমাদের জন্যে তোকে বলছি না, মুরগিছানাগুলোর জন্যেই তোকে বলছি।'

এভাবে তাকে বলায় সে আর আপত্তি করতে পারলো না। তাকে কী করতে হবে আমি দেখিয়ে দিলাম।

—এই থারমোমিটারটা দেখছিস তো,—আমি বল্‌লাম।—পারাটাকে ঠিক ১০২ ডিগ্রীতে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। তোর মনে থাকবে তো?

—হ্যাঁ, আমার মনে থাকবে।

সঠিক হবার জন্যে যেখানে পারাটা দাঁড়িয়ে থাকার কথা সেখানটা লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দিলাম।

—ভালো করে বুঝে নে, কিছু যেন গুলিয়ে না যায়, — আমি বল্লাম। — যক্ষুনি দেখবি পারাটা একটুখানিও ওপরে উঠছে তক্ষুনি বাতিটার তলা থেকে একটা খাতা বার করে নিবি। বাতিটা নীচে নামলে থারমো-মিটারের পারাটাও নীচে নেমে আসে। বুঝলি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি।

তারপর তাকে দেখালাম কি করে ডিমগুলো উল্টোতে হয় আর বল্লাম এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ইন্‌কুবেটরটা খুলে ডিমগুলো উল্টে দেয়।

মায়া বুঝলো। সে ঠিক মতো বুঝেছে কি না জানবার জন্যে আমার নির্দেশগুলি তাকে দিয়ে আবার বলালাম। তারপর মিশ্‌কা আর আমি স্কুলে গেলাম।

স্কুলে আমাদের ক্লাশ-ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই কোস্তিয়া প্রশ্ন করলো, 'তোদের ইন্‌কুবেটরটা কী রকম চলছে?'

—শ্‌-শ্‌-শ্‌, —মিশ্‌কা ফিস্‌ফিসিয়ে উঠলো, তারপর চারিদিকে চেয়ে দেখলো আর কেউ শুন্‌তে পেয়েছে কি না।

—আমি তো ফিস্‌ফিস করেই বলছিলাম।

—ফিস্‌ফিসানি! —মিশ্‌কা গজরে উঠলো। —তুই তো একেবারে গলা সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচাচ্ছিলি।

—বেশ বেশ, এখন থেকে বোবা হয়ে যাবো। কিন্তু আমার অনুরোধ সবাইকে কথাটা বলতে দে।

—যদি তুই বলিস তাহলে আর আমাদের সঙ্গে কখনো দেখা করতে আসিস না। তুই প্রতিজ্ঞা করেছিলি কথাটা গোপন রাখতে আর এখন কিনা তুই…

—ভালো কথা, আমি চুপ করে থাকবো। শোন্, একটা চমৎকার বুদ্ধি খেলেছে। প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্লাশে মারিয়া পেত্রোভ্‌নাকে তোদের ইন্‌কুবেটরটার কথা বল্‌বো। তিনি খুব খুসী হবেন।

—এতো তোর সাহস! মারিয়া পেত্রোভ্‌নাকে বল্‌লে ক্লাশের সব ছেলেরা শুনে ফেলবে।

—আচ্ছা আচ্ছা, আমি চুপ করে থাকবো। কবরখানার মতোই আমি চুপ করে থাকবো।

হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে চলে গেল। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় আমাদের ইন্‌কুবেটরের কথাটা কাউকে না কাউকে বলার জন্যে সে ছটফট করছে।

পড়া সুরু হলো। ইন্‌কবেটরটার দুর্ভাবনায় মিশ্‌কা স্থির হয়ে বসতে পারছিল না।

—মায়া যদি কিছু ভুল করে তাহলে কী হবে?

—কিন্তু কী সে করতে পারে?

—তাপের দিকে নজর রাখতে হয়তো সে ভুলে যেতে পারে।

—কিন্তু আমি তো তাকে কড়া নির্দেশ দিয়ে এসেছি।

—ধর বাড়ীতে থাকতে থাকতে হয়তো তার বিরক্ত ধরে গেছে আর গিয়েছে সে বাইরে খেলতে?

—সে তো প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল সে যাবে না।

—ইন্‌কুবেটরের ভেতর থেকে তার বাটিগুলো নিয়ে সে যদি চলে যায় তাহলে কী হবে?

—ও রকম সে করবে না।

—হয়তো বিজলি বাতির বাল্‌ব্‌টা খারাপ হয়ে গেছে। তাহলে আমরা কী করবো?

প্রাকৃতিক ইতিহাসের ক্লাশে মিশ্‌কা আর আমি এতো বক্ বক্ করছিলাম যে মারিয়া পেত্রোভ্‌না আমাদের আলাদা করে দিলেন। ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে মিশ্‌কা আমার দিকে কট্‌মট্ করে চাইতে লাগলো, সে বসেছিল ঠিক যেন বজ্রভরা মেঘের

নত। ব্যাপারটাকে আরো খারাপ করার জন্যেই যেন কোস্তিয়া মুখের কাছে দুটো হাত এনে জোরালো ফিস্‌ফিসে স্বরে বলে উঠলো:

—এই শোন্! তোদের ইন্‌কুবেটরটার কথা মারিয়া পেত্রোভ্‌নাকে বলছি।

মিশ্‌কা তার বসার জায়গায় ছট্‌ফট্ করতে করতে ফিস্‌ফিসে গলায় উত্তর দিল:

—প্রতারক, নীচ!

কিন্তু কোস্তিয়া ইতিমধ্যে ওপরে হাত তুলেছে।

—কী বল্‌বে কোস্তিয়া? —মারিয়া পেত্রোভ্‌না প্রশ্ন করলেন।

কোস্তিয়ার দিকে মিশ্‌কা ঘুঁষি তুলে শাসাতে লাগলো।

সরল গলায় কোস্তিয়া প্রশ্ন করলো, 'মারিয়া পেত্রোভ্‌না, ইন্‌কুবেটর কী জিনিস?'

মারিয়া পেত্রোভ্‌না বোঝাতে সুরু করলেন ইন্‌কুবেটর কাকে বলে। তিনি বল্‌লেন অনেক অনেক দিন আগে তা দেওয়া মুরগি ছাড়াও ডিমগুলোকে এক বিশেষ তাপে রেখে মানুষ শিখেছিল কী করে মুরগিছানা ফোটাতে পারা যায়। এমন কি দুহাজার বছর আগেও প্রাচীন মিশর ও চীন দেশে ইন্‌কুবেটর ছিল। প্রাচীন মিশরবাসীদের তৈরী ইন্‌কুবেটর প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেছেন। সেগুলো অবশ্য খুব বড় নয় আর সেগুলো দিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো ডিমে তা দেওয়া যায় না। কিন্তু আজকের দিনে এমন ইন্‌কুবেটর আছে যার ভেতরে কয়েক হাজার ডিম একসঙ্গে ধরে যায়।

কোস্তিয়া বল্‌লো, 'দুজন ছেলের কথা আমি জানি যারা নিজেরাই একটা ইন্‌কুবেটর বানিয়েছে। আপনি কি মনে করেন তারা মুরগিছানা ফুটিয়ে বার করতে পারবে?'

উত্তরে মারিয়া পেত্রোভ্‌না বললেন, 'বাড়ীতে তৈরী ইন্‌কুবেটর দিয়ে মুরগিছানা ফোটানো যায় কিন্তু তাতে অনেক ঝামেলা। কারখানায় তৈরী ইন্‌কুবেটরে তাপ এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের নানা উপায় আছে। কিন্তু বাড়ীতে তৈরী ইন্‌কুবেটরের দিকে সব সময় ভালো করে নজর রাখা দরকার। তোমার বন্ধুদের যদি অধ্যবসায় থাকে তাহলে তারা সফল হবে। কিন্তু তারা যদি আমাদের মিশা আর কোলিয়ার মতো ছেলে হয় তাহলে কিছুই ঘটবে না।'

মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো, 'কেন? কেন আমরা পারবো না?'

—কারণ ক্লাশ-ঘরেও তোমরা ভারি অমনোযোগী থাকো আর অসভ্যতা করো,—মারিয়া পেত্রোভ্‌না এই কথা বলে পড়িয়ে চল্‌লেন।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরছি ঠিক সেই সময় ভিতিয়া স্যির্গোভ আমাদের ধরে বল্‌লো সেই দিনই ছোটদের প্রাণিতত্ত্ববিদ মণ্ডলীতে আমাদের কাজ করার কথা।

—না না, আজকে অসম্ভব,—উত্তেজিত হয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো।—আমাদের একেবারে সময় নেই।

—তোমাদের কোনো কিছুর জন্যেই সময় থাকে না। যদি না আসবে তাহলে মণ্ডলীতে যোগ দিয়েছিলে কেন? এখন বসন্তকাল, সবচেয়ে ব্যস্ত থাকার সময় এখন। আমাদের পাখীর বাসা করতে হবে।

—পরে আমরা পাখীর বাসা বানাবো।

—কিন্তু পাখীগুলো শীগ্‌গিরই এসে পৌঁছুবে।

—না, তারা আসবে না।

—তোমরা ভাব কী? তোমরা কি মনে করো পাখীগুলো তোমাদের জন্যে **অপেক্ষা করবে?**

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'তারা অল্প কয়েক দিন অপেক্ষা করবে।'

দৌড়ে আমরা বাড়ী গেলাম।

সব কিছু ঠিক আছে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম। বাল্‌ব্‌টা পুড়ে যায়নি আর তাপও ঠিক আছে।

ইন্‌কুবেটরের পাশে মায়া তার জায়গায় বসে আছে। তাকে আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে খেলতে পাঠালাম।

ভীষণ বিপদ

তারপর থেকে আমাদের জীবনের দৈনিক কাজ হলো থারমোমিটারটায় লক্ষ্য রাখা, তিন ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া ডিমগুলো উল্টোনো, জলের পাত্রে আর কাঠের বাটিগুলোয় জল ভরা, কারণ জল তাড়াতাড়ি উপে যায়। এটাকে কঠিন কাজ বলা

যায় না, কিন্তু সবসময়ই লক্ষ্য রাখা দরকার। নাহলে কিছু না কিছু ঘটবেই—হয় তাপ হঠাৎ বেড়ে যাবে না হয় তো ডিমগুলোকে ভুলে যাবে উল্টোতে। সবসময়ই ইন্‌কুবেটরটার ওপর খেয়াল রাখা দরকার।

রাত্রে লক্ষ্য রাখতে হয় বলে মিশ্‌কার অবস্থা হোলো সবচেয়ে খারাপ। রাত্রে সে ভালো ঘুমতে পারতো না এবং দিনের পর দিন শরৎকালের ঝিমন্ত মাছির মত ঘুরে বেড়াতো। প্রায়ই সে দুপুরের খাবার পর রান্নাঘরের সোফায় অল্পক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে নিতো। এবং যখন সে ঘুমতো আমি আমার আঁকবার খাতা বার করে তার ছবি এঁকে নিতাম।

পাঁচ দিন পাঁচ রাত এ ভাবে কাটলো। ছ'দিনের দিন স্কুলের ক্লাশে পড়ানোর ঠিক মধ্যেখানে সে ঘুমিয়ে পড়লো। নাদেজ্‌দা ভিক্তরভ্‌না তাকে বকেছিলেন আর ক্লাশশুদ্ধ সবাই তাকে ঠাট্টা করেছিল।

বলা বাহুল্য মিশ্‌কার খুব খারাপ লাগলো। অন্যের বেলা হাসতে প্রত্যেকেরই ভালো লাগে কিন্তু নিজেকে নিয়ে হাসতে কেউই পছন্দ করে না।

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হলো ছেলেদের দেখাবার জন্যে সেইদিনই আমার আঁকবার খাতাটা এনেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তারা ধরে ফেল্‌লো ঘুমবার নানা অবস্থায় মিশ্‌কার ছবি আমি এঁকেছি—কখনো শুয়ে, কখনো বসে আর কখনো আধোদাঁড়ানো অবস্থায়।

লিওশা কুরচ্‌কিন মিশ্‌কাকে বল্‌লো, 'ঘুমের ব্যাপারে বাস্তবিক তোর কোনো জুড়ি নেই।'

সেনিয়া বব্‌রোভ জুড়ে দিলো, 'আন্তর্জাতিক রেকর্ড ও ভেঙেছে। ঘোড়ার মত দিনে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুময়।'

হাতে হাতে ছবিগুলো ঘুরতে লাগলো। প্রত্যেকেই মজাদার মজাদার মন্তব্য করে হাসিতে ফেটে পড়লো।

—এখানে কী জন্যে তোর ঐ বোকাটে ধরণের ছবিগুলো এনেছিস?—মিশ্‌কা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমি বল্‌লাম, 'কী করে জানবো এগুলোকে ওরা এতো মজাদার বলে ভাববে?'

—আমাকে নিয়ে ক্লাশের সবাই যাতে হাসি ঠাট্টা করতে পারে সেজন্যে ইচ্ছে করেই তুই এনেছিস। আচ্ছা বন্ধু তুই! এর পর থেকে তোর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ থাকবে না।

প্রতিবাদ করে আমি বল্লাম, 'মিশ্কা, দিব্যি গেলে আমি বল্ছি ওজন্যে এগুলোকে আমি আনিনি, সত্যিই না। এরকম ঘটবে জান্লে কক্ষোণো তোর ছবি আঁকতাম না।'

তা সত্বেও সমস্তদিন মিশ্কা আমার সঙ্গে কথা বল্লো না। সন্ধের দিকে সে বল্লো:

—আমার বোকাটে ধরণের ব্যঙ্গ চিত্র না এঁকে ইন্কুবেটরটাকে তোর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া উচিত যাতে তুইও রাত্রিবেলায় কিছু পাহারা দিতে পারিস।

আমি বল্লাম, 'আমার আপত্তি নেই। তুই পাঁচ রাত ধরে পাহারা দিয়েছিস। এবার আমার পালা।'

ইন্কুবেটরটাকে আমার বাড়ীতে আমরা নিয়ে এলাম। আর তারপর থেকেই সুরু হলো আমার অশান্তি।

প্রত্যেক রাত্রে এ্যালার্ম ঘড়িটাকে আমার মাথার তলায় রাখি আর মাঝরাত্রে ঠিক আমার কাণের পাশে সেটা বেজে ওঠে। আমার ঘুম ভেঙে যায় আর টলতে টলতে রান্নাঘরে যাই, দেখি তাপ ঠিক আছে কি না, ডিমগুলোকে উল্টোই আর টলতে টলতে আবার বিছানায় ফিরে আসি। প্রথম দিকে আমি ঘুমতে পারতাম না, কিন্তু যে সব মিনিট ধরে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকতাম এ্যালার্ম ঘড়ি সে সময় আবার বেজে উঠতো যতক্ষণ না আমি আমাকে ঘুমতে না দেবার জন্যে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে উদ্যত হতাম।

প্রতিসকালে এমন মাথাভার নিয়ে আমার ঘুম ভাঙতো যে বিছানা ছেড়ে আমি প্রায় উঠতেই পারতাম না। আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় জামাকাপড় আমি পরতাম। ভালো করে বুঝতেই পারতাম না প্যাণ্টটাকে মাথায় গলাচ্ছি না শার্টের হাতা দুটোয় পাদুটো চালাচ্ছি। একদিন তো উল্টো পায়ে বুটজুতোগুলো পরেছিলাম। ছেলেরা সেটা লক্ষ্য

করে আমাকে বিদ্রূপ করতে সুরু করলো, ফলে পড়াশোনবার মাঝখানেই সেগুলোকে বদলাতে হলো।

কিন্তু সবচেয়ে বিপদ ঘটলো দশম রাত্রে। আমি জানি না ঘড়িটায় দম দিতে ভুলে গিয়েছিলাম না কি যখন সেটা বেজেছিল আমি শুন্‌তে পাইনি। যাই হোক, ঘুমতে সুরু করে সকাল না হওয়া পর্যন্ত জাগিনি যখন চোখ খুলে তাকালাম তখন পরিষ্কার দিনের আলো হয়ে গেছে। প্রথমে আমি বুঝতেই পারিনি কী ঘটেছে, কিন্তু তারপরেই মনে পড়লো রাত্রে একবারো উঠিনি। এক লাফে বিছানা ছেড়ে দৌড়ে ইন্‌কুবেটরটার কাছে গেলাম। থারমোমিটারে তখন ৯৯ ডিগ্রী নেমে রয়েছে। যা থাকা উচিত তার থেকে পূরো তিন তিনটি ডিগ্রী কম! তাড়াতাড়ি আমি দুটো লেখার খাতা বাতিটার তলায় গুঁজে দিলাম। কিন্তু মনে মনে জানি এতে কোনো ফল হবে না। ইতিমধ্যে ডিমগুলো নিশ্চয়ই বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দশ দিনের কঠিন পরিশ্রম নিরর্থক হলো! ভ্রূণগুলো নিশ্চয়ই এতোদিনে বেশ বড় হয়ে উঠেছিল আর আমি কিনা নিজেই সব কিছু নষ্ট করে ফেল্‌লাম!

নিজের ওপর নিজে চটে উঠলাম, কপাল চাপড়ালাম।

পারাটা আস্তে আস্তে ১০২ ডিগ্রীতে উঠলো। সেটার দিকে দেখতে দেখতে বিষণ্ন মনে ভাবলাম:

'এইবার ঠিক, তাপটা এখন স্বাভাবিক হয়েছে। আগেও যেরকম দেখাচ্ছিল ডিমগুলোকে এখন সেরকমই দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেগুলো গেছে মরে। ফলে কোনো মুরগিছানাই আর জন্মাবে না।'

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হয়তো কিছুই ঘটেনি, হয়তো ভ্রূণগুলো মরবার সময়ই পাইনি। কী করে আমরা সে কথা জানতে পারি? একমাত্র উপায় হচ্ছে ডিমগুলোকে গরম করে যাওয়া। যদি একুশ দিনের দিন মুরগিছানা না ফোটে তাহলে বুঝতে হবে সেগুলো মরে গেছে। হয়তো সেগুলো মরেনি। কিন্তু সে কথা এগারো দিনের আগে আমি জানতে পারবো না!

বিষণ্ন মনে আমি ভাবলাম, 'এই শেষ আমাদের আমুদে পরিবারের! বারোটা ছোট্ট মুরগিছানার জায়গায় আমাদের একটাও হবে না।'

ঠিক তখনোই মিশ্‌কা হাজির হলো। থারমোমিটারের দিকে চেয়ে সে উৎসাহিত হয়ে বল্‌লো:

—চমৎকার! তাপটা একেবারে ঠিক রয়েছে। সব কিছুই চমৎকার চলেছে। এবার আমার রাত্রে পাহারা দেবার পালা।

আমি বল্‌লাম, 'না না, আমি বরং চালিয়ে যাই। মিছি মিছি তুই কেন কষ্ট পাবি?'

—মিছি মিছি মানে?

—ধর মুরগিছানাগুলো যদি ফুটে না বেরোয়?

—নাই-বা যদি বেরোয়, সব কষ্টকর কাজ যে তোকেই করতে হবে তার তো কোনো মানে নেই। আমরা দুজনে বন্ধু অতএব আমাদের নিজের নিজের ভাগের কাজ আমাদের করতে হবে।

কী বল্‌বো ভেবে পেলাম না। সত্যি কথাটা স্বীকার করার সাহস আমার হলো না, তাই ঠিক করলাম এ বিষয়ে কোনো কথা না বলতে। আমি জানি এটা আমার ভালো কাজ হয়নি, কিন্তু এটা না করে আমি পারলাম না।

পাইওনীয়ার্‌দের* সমাবেশ

প্রতিদিন কোস্তিয়া আমাদের দেখতে আসতো তারপর সাঙ্গোপাঙ্গদের জানাতো ডিমে তা দেওয়ার ব্যাপারটা কী ভাবে এগুচ্ছে। অবশ্য সে তাদের বলেনি যে মিশ্‌কা আর আমি ইন্‌কুবেটরটা বানিয়েছি। সে বুঝিয়েছিল যে অন্য একটি স্কুলের ছেলেরা সেটা বানিয়েছে।

একদিন ভিতিয়া স্মির্নোভ বল্‌লো, 'সে ছেলেগুলোর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

—কেন?

---

* পাইওনীয়ার—রুশ দেশের আট থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের এক প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

—তাদের চিত্তাকর্ষক বলে মনে হচ্ছে। আমাদের ছোট প্রাণিতত্ত্ববিদ মণ্ডলীতে তাদের পেলে ভালো হোতো। তাহলে সব কিছুই খুব ভালো হতো। কিন্তু মিশা আর কোলিয়ার মতো ছেলেদের নিয়ে কিছুই করা যায় না। কোনো কাজেই তারা করতে চায় না। গাছ পোঁতবার ব্যাপারে তারা সাহায্য করেনি আর এখন তারা পাখীর বাসাও তৈরী করছে না…

মিশ্‌কা আর আমার দিকে চোখ মটকিয়ে কোস্তিয়া বল্‌লো, 'ও ছেলেগুলোও তো গাছ পোঁতোনি।'

—সেটা অন্য কথা। গাছ পোঁতা ছাড়াও অনেক কাজ তাদের আছে।

ঐ ছেলেগুলো বল্‌তে যে মিশ্‌কা আর আমাকে কোস্তিয়া উল্লেখ করছিল সে কথা ভিতিয়া একেবারেই ধারণা করতে পারেনি।

দুর্ভাবনা করার মত আমাদের অনেক কিছু ছিল। ইন্‌কুবেটরটার জন্যে লেখাপড়ায় অবহেলাও আমরা করেছিলাম, ফলে পাটীগণিতে পাঁচের মধ্যে দুই আমরা দুজনেই পেয়েছি।

আলেক্সান্দ্র্ এফ্রেমভিচ ব্ল্যাকবোডে একটা অঙ্ক কষতে আমায় দিয়েছিলেন। সেটা কষতে না পারায় আমায় তিনি দুই দিলেন। তারপর তিনি মিশ্‌কাকে ডাকলেন আর তাকে দিলেন ২+*। অবশ্যই ঐ নম্বরই আমাদের পাবার কথা কারণ অঙ্কটা আমরা শিখিনি। কিন্তু কম নম্বর পেতে খারাপ লাগবারই তো কথা।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'তোর পক্ষে অত কিছু খারাপ হয়নি। তুই পেয়েছিস দুই আর আমি পেয়েছি ২+।'

আমি বল্‌লাম, '২+ তো দুই-এর থেকে বেশী।'

—বাজে কথা! দুই-এর পরে একটি+চিহ্ন তো আর তাকে তিন করে না, করে কী?

---

* ২+, ২—: রুশ দেশে সব পরীক্ষায় দৈনিক পড়াশুনোয় পূরো নম্বর হোলো ৫। পরীক্ষায় যে ৫-এর মধ্যে ৫ পায় সে সবচেয়ে ভালো। যে ৪ পায় সে ভালো। যে ৩ পায় সে সাধারণ। তার কম পেলে—খারাপ।

—না, দুই-ই থাকে।

—তাহলে + চিহ্নটার কী দরকার?

—মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝছি না।

—তোকে বলি শোন। দুই পেলে যাতে তোর মন খারাপ না হয় সেইজন্যে ঐ +চিহ্নটা। এটা যেন বলা হচ্ছে যে তোর জন্যে রয়েছে সুন্দর একটি + চিহ্ন। কিন্তু দুই দুই-ই থাকে। তাইতেই মনটা খারাপ হয়।

—মনটা খারাপ হয় কেন?

—কারণ এতে বোঝায় তুই একটা গাধা। নাহলে শুধু একটা দুই তোকে বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট হতো যে তুই কিছুই জানিস না। কিন্তু বোকাছেলের পক্ষে দুই-এর পর একটা + চিহ্ন থাকা দরকার যাতে সে মনে না করে তার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। কিন্তু আমি নিজেকে বোকা বলে ভাবতে ভালোবাসি না। দুই-এর পর একটা বিয়োগ চিহ্নও তুই পেতে পারিস,—সে বলে চল্‌লো, বিয়োগ এগুলোর মানে আমি কিছু বুঝি না। দুই মানে তুই কিছু জানিস না। কিন্তু কিছু না জানার চেয়ে কম কী করে তুই জানতে পারিস?

আমি বল্‌লাম, 'তা জানা যায় না।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমিও তো সে কথা বলছি! দুই-এর পর বিয়োগ চিহ্নের মানে হচ্ছে যে তুই যে কিছু জানিস না তা শুধু নয়, তুই কিছু জানতে ইচ্ছেও করিস না। একেবারে পড়া তৈরী না করলে তুই দুই পাস, কিন্তু তুই যদি একেবারে বাজে হোস তাহলে ওরা তোকে দুই-এর পর একটা বিয়োগ চিহ্ন দেয় যাতে তুই সেকথা বুঝতে পারিস। জানিস, এক-ও তুই পেতে পারিস',—বল্‌তে বল্‌তে সে মেতে উঠ্‌লো।

কিন্তু আলেক্সান্দ্‌ এফ্রেমভিচ আমাদের আলাদা করে দিলেন বলে সে আর কিছু বলার অবকাশ পেলো না।

জেনিয়া স্কভরৎসোভ টিফিনের ঘণ্টায় বল্‌লো, 'পড়াশুনো হবার পর ক্লাশে থাকিস। আমাদের একটা সভা হবার কথা আছে।'

মিশ্‌কা আর আমি বল্‌লাম, 'কিন্তু আমরা তো থাকতে পারবো না, আমাদের সময় নেই।'

জেনিয়া বল্‌লো, 'তোদের থাকতেই হবে। কারণ আমরা তোদের সম্বন্ধেই আলোচনা করতে যাচ্ছি।'

—আমরা কী করেছি? আমাদের সম্বন্ধে আলোচনা করার কারণ কী?

জেনিয়া শুধু বল্‌লো, 'সভাতেই সে কথা তোরা জান্‌তে পারবি।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'ভালো কথা! শুধু এখনই আমরা দুই পেলাম আর তাই নিয়েই ওরা একটা সভা ডাকতে বসেছে। আমাদের দলের সর্দার বলে ও মনে করে যে কোনো ছেলের জন্যেই ও সভা ডাকতে পারে। যেদিন ও নিজে দুই পাবে সেদিন দেখা যাক, আমি চাই সেদিনও ও একটা সভা ডাকে।'

আমি বল্‌লাম, 'ও কখনোই দুই পাবে না, লেখাপড়ায় ও ভালো।'

—ওর হয়ে তুই কেন বলছিস?

—ওর হয়ে আমি কিছু বলছি না।

মিশ্‌কা গজরাতে লাগলো, 'দেখছি আমাদের থাকতেই হবে।'

আমি বল্‌লাম, 'ভালো কথা। মায়া ইন্‌কুবেটরটার ওপর লক্ষ্য রাখছে।

সভার জন্যে আমাদের থাকতে হলো।

জেনিয়া স্কভরৎসোভ বলতে সুরু করলো, 'আজ আমরা নম্বর এবং আমাদের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো। কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি ছেলে ক্লাশে অসভ্যতা করে, ছটফট করে, বক্‌বক্ করে আর অন্যদের কাজে বাধা দেয়। মিশা এবং কোলিয়াই এ বিষয়ে চরম অপরাধী। বক্‌বক্ করার জন্যে তাদের আলাদা আলাদা জায়গায় বসাতে হয়েছে। এ ভাবে চলতে পারে না। এটা মোটেই ভালো নয়। আর ব্যাপারটা চরমে পেঁাচেছে কারণ আজকেই তারা দুজনে পেয়েছে দুই করে।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'মোটেই আমরা দুজনে ওরকম পাইনি। আমি পেয়েছি দুই-এর পর একটা + চিহ্ন।'

জেনিয়া বল্‌লো, 'তাতে কিছু যায় আসে না। অন্যান্য বিষয়েও তোমরা কম নম্বর পাচ্ছো।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘অন্য কোনো বিষয়ে আমরা দুই পাইনি, কেবল রুশ ভাষায় আমি পেয়েছি তিন।’

ভানিয়া লোজ্‌কিন জুড়ে দিল, ‘তিন-এর পর একটা বিয়োগ চিহ্ন পেয়েছে।’

মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘তুই নাক গলাতে আসিস না বলছি।’

—বলতে চাস কী? পাইওনীয়ারদের সভা এটা। যা খুসী বল্‌বার অধিকার আমার আছে।

—তার জন্যে সভার অনুমতি আগে নিতে হবে।

—ভালো কথা, আমি কিছু বলতে চাই। বন্ধুরা, এরা যে খারাপ নম্বর পাচ্ছে তার কারণ আমাকে জিগ্‌গেস করলে বলবো হালে তারা যে কোনো কারণেই হোক বাড়ীর পড়া তৈরী করে না। এরা বলুক কারণটা কী।

জেনিয়া বল্‌লো, ‘ঠিক কথা, আমাদের বলো।’

মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘কোনোই কারণ নেই।’

লিওশা কুরচ্‌কিন বল্‌লো, ‘কারণটা কী আমি জানি। ক্লাশের মধ্যে সব সময় ওরা গল্প করে আর মাষ্টার মশাইদের কথা শোনে না। বাড়ীতেও তারা লেখাপড়া করে না। আমার তো মনে হয় চিরকালের মতো তাদের আলাদা করে দেওয়া দরকার। তাহলে তাদের বক্‌বকানি থামবে।’

মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘আমাদের তোমরা আলাদা করতে পারবে না। আমরা দুজনে দুজনের বন্ধু। বন্ধুদের তোমরা আলাদা করতে পারো না, পারো কী?’

সেনিয়া বব্‌রোভ বল্‌লো, ‘বন্ধু হলে যদি তোমাদের ক্ষতিই হয় তাহলে আলাদা করে দেওয়াই ভালো।’

এই প্রশ্নে কোস্তিয়া আমাদের হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লো, ‘কে কোথায় শুনেছে বন্ধুত্ব কারুর অপকার করে।’

—এদের বেলায় তাই ঘট্‌ছে, কারণ এরা একজন অন্যকে অনুকরণ করে চলে। এদের মধ্যে একজন কেউ কথা বললে অন্য জনও বলে, এদের মধ্যে কেউ যদি পড়া করতে না চায় অন্য জনও করে না। একজন দুই পেলে অন্য জনও দুই পায়। না না, এদের আলাদা করে দেওয়াই উচিত,—ভিতিয়া স্মির্নোভ বল্‌লো।

কোস্তিয়া বল্‌লো, 'আর এক মিনিট। ইচ্ছে করলেই এদের আমরা আলাদা করে নিতে পারি। কিন্তু প্রথমে দেখা যাক আমরা এদের সাহায্য করতে পারি কী না। ধরো এদের যদি লেখাপড়া করার সময় না থাকে?'

—সময় না থাকে মানে?

—ধরো ওরা একটা খুব দরকারী কাজ করতে ব্যস্ত।

হেসে সেনিয়া বব্‌রোভ বল্‌লো, 'খুব দরকারী কাজ? কী সেটা হতে পারে?'

—ধরো ওরা যদি একটা ইন্‌কুবেটর তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকে?

আবার হেসে সেনিয়া বল্‌লো, 'ওরা? ইন্‌কুবেটর?'

—হ্যাঁ, ইন্‌কুবেটর। তোমরা মনে করো এটা সহজ কাজ? হয়তো তাপমাত্রার ওপর নজর রাখার জন্যে রাতের পর রাত ওরা ঘুময় না। হয়তো সমস্তদিন ধরে এটা নিয়ে কাজ করছে আর এখন আমরা ওদের এখানে বকতে সুরু করেছি। হয়তো…

জেনিয়া রেগে বল্‌লো, 'এসব রহস্যের মানে আমি জানতে চাই। ওরা কি বাস্তবিকই একটা ইন্‌কুবেটর বানিয়েছে?

কোস্তিয়া বল্‌লো, 'হ্যাঁ।'

ভিতিয়া বল্‌লো, 'যে ছেলেদের, কথা তুই বলছিলি ওরা বোধ হয় তাদের নকল করেছে।'

কোস্তিয়া বল্‌লো, 'না, ওরা কাউকেই নকল করেনি। ওরাই হচ্ছে সেই ছেলেরা যাদের কথা বলেছিলাম।'

—বলিস কী?

—ঠিকই বলছি।

—কিন্তু—কিন্তু তুই যে বলেছিলি তারা অন্য স্কুলের ছেলে?

—কেবল মজা করার জন্যেই বলেছিলাম।

প্রত্যেকে মিশ্‌কা আর আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো:

—তাহলে তোরা নিজেরাই একটা ইন্‌কুবেটর বানিয়েছিস?

ভিতিয়া স্মির্নোভ বল্‌লো:

—কি লজ্জার কথা! এরকম কাজ সত্যিকারের প্রাণিতত্ত্ববিদরা কখনোই করে না। ভেবে দেখ ইন্‌কুবেটর বানিয়ে সে বিষয়ে একেবারে চুপ করে থাকা! তোদের ধারণা কি এরকম কোনো ব্যাপারে আমরা কৌতূহলী হবো না? এটাকে তোরা কেন গোপন করে রেখেছিলি?

আমরা বল্‌লাম, 'ভেবেছিলাম তোরা হয়তো হেসে উড়িয়ে দিবি।'

—হাসবো কেন? এতে হাসির কী আছে? বরঞ্চ আমরা হয়তো তোদের সাহায্য করতে পারতাম। তাপমাত্রার দিকে নজর রাখার কাজে পালা করে জেগে আমরা তোদের সাহায্য করতে পারতাম। কাজটা তাহলে তোদের পক্ষে সহজ হতো আর তোরা বাড়ীতে লেখাপড়া করার সময় পেতিস।

ভাদিক জাইৎসেভ বল্‌লো, 'বন্ধুরা, ঐ ইন্‌কুবেটরের দায়িত্ব এসো আমরা সবাই নিই।'

প্রত্যেকে তারা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঠিক বলেছো।'

ভিতিয়া বল্‌লো, দুপুরের খাবার পর আমাদের সঙ্গে সে দেখা করবে তারপর ছকে ফেলবে যাতে আর সবাই পালা করে লক্ষ্য রাখতে পারে।

আর তারপর সভা শেষ হলো।

মুরুব্বিদের কাজ সুরু হলো

দুপুরের খাবার পর ছোটদের প্রাণিতত্ত্ববিদ মণ্ডলীর প্রায় সবাই আমাদের রান্নাঘরে জড়ো হলো। ইন্‌কুবেটরটা তাদের আমরা দেখালাম আর বল্‌লাম কী করে গরম করবার জিনিসটা কাজ করে, কী করে আমরা তাপটা পরখ করে দেখি আর কী করে নিয়মিত সময় মাফিক ডিমগুলো আমরা উল্টোই। তারপর আমরা তালিকা মাফিক কী ভাবে কাজ করতে হবে সেটা ছকে ফেল্‌লাম। কিন্তু প্রথমে, ভিতিয়া স্মির্ণোভের প্রস্তাবে আমরা যারা কাজে থাকবে তাদের জন্যে নিয়মকানুন লিখে ফেল্‌লাম।

ঠিক হলো স্কুলের ছুটির পর দুটি কোরে ছেলে আমাদের বাড়ীতে আসবে আর মিশ্‌কা আর আমি তাদের বল্‌বো কী করতে হবে এবং বাকি দিনটা ধরে তাদের ওপর ইন্‌কুবেটরটার ভার থাকবে। তারা পালা করে বাড়ী যাবে পড়া করতে আর খেতে। তাদেরই কর্তব্য হবে দেখা যাতে মিশ্‌কা আর আমি ইন্‌কুবেটরটার কাছে ঘুরঘুর না করি লেখাপড়া করার বদলে।

তারপর ভিতিয়া ফর্দ তৈরী করলো যাতে প্রত্যেকে জানতে পারে কোন দিন কার পাহারা দেবার পালা। সেই ফর্দটাকে আমরা দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলাম।

মিশ্‌কা প্রশ্ন করলো, 'ফর্দে আমাদের নাম নেই কেন? আমাদের কী বাদ দিয়ে দেওয়া হবে?'

উত্তরে ভিতিয়া বল্‌লো, 'রাত্রিতে কী হবে? পালা করে তোমাদের রাত্রে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

তারপর জেনিয়া সবছেলেদের ছুটি দিয়ে দিলো।

সে বল্‌লো, 'আজ যে দু'জনের পাহারা দেবার কথা তারা ছাড়া আর সবাই যেতে পারো। প্রত্যেকের থাকার দরকার নেই।'

জেনিয়া, ভিতিয়া, মিশ্‌কা আর আমি ছাড়া বাকি সবাই চলে গেল।

আমরা যখন একলা হলাম জেনিয়া তখন বল্‌লো, 'তোমরাও চলে যাও।'

—আমরা কোথায় যাবো?

—যাও গিয়ে পড়া তৈরী করো।

—কিন্তু ধরো যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায়।

—কিছুই গোলমাল হবে না। যদি কিছু হয় তাহলে তোমাদের আমি ডাকবো।

—আচ্ছা বেশ। ঠিক ডেকো কিন্তু।

অতএব মিশ্‌কা আর আমাকে পড়া তৈরী করতে বসতে হলো। আমরা ভূগোল আর ব্যাকরণ পড়লাম আর একটা অঙ্ক কষলাম। দুটো অঙ্ক ছিল, কিন্তু অন্যটা ভারি কঠিন। তাই সেটাকে রেখে রান্নাঘরে কী হচ্ছে দেখবার জন্যে আমরা গেলাম।

যখন আমরা ভেতরে ঢুকলাম জেনিয়া বল্‌লো, 'এখানে তোমরা কী করছো? তোমাদের পড়া তৈরী করতে বলা হয়নি?'

—ইতিমধ্যেই আমরা করে ফেলেছি।

—করে ফেলেছো? তোমাদের লেখার খাতাগুলো দেখি একবার।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আরে, ব্যাপারটা কী? পরখ করে দেখবি নাকি?'

—তোমাদের ভার আমরা নিয়েছি, তাই তোমাদের জন্যে আমরা দায়ী, বুঝলে?

আমরা লেখার খাতাগুলো নিয়ে এলাম।

—কিন্তু তোমরা যে কেবল একটা অঙ্ক করেছো। দুটো অঙ্ক আছে যে।

—অন্যটা পরে আমরা করবো।

—না না, এক্ষুনি তোমাদের করতে হবে। পরে করবো বলে তুলে রাখলে তোমরা ভুলে যাবে আর তারপর কাল তোমরা স্কুলে হাজির হবে কিছু না করে।

—আমরা তো একটা অঙ্ক করেছি, করিনি কি?

জেনিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌লো, 'একটা যথেষ্ট নয়। প্রবাদটা তো তোমরা জানো: 'কাজে শেষ হলে তবেই ফুর্তি করার সময়।'

তাই আমাদের ফিরে গিয়ে অঙ্কটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হোলো। বারবার আমরা কষলাম কিন্তু কিছুতেই সেটা হলো না। পূরো একটা ঘণ্টা সেটার পেছনে আমরা দিলাম, আর তারপর রান্নাঘরে ফিরে গেলাম।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'কিছুতেই এটা হচ্ছে না। সব কিছুই আমরা ঠিক মতো করেছি, কিন্তু বইটার পেছনে উত্তর দেওয়া আছে সেটার সঙ্গে আমরা যে উত্তর পাচ্ছি সেটা মিলছে না। নিশ্চয়ই ছাপার ভুল।'

জেনিয়া বল্‌লো, 'তাতো বটেই, বইটার ঘাড়েই দোষ চাপাও!'

—আগেও এরকম ঘটেছে যে বইতে যে উত্তর দেওয়া আছে সেটা ঠিক নয়।

জেনিয়া বল্‌লো, 'যত সব বাজে কথা! ওটা একবার দেখা যাক।'

আমাদের সঙ্গে সে ঘরে এলো আর আমরা কী করেছি সে দেখলো। অঙ্কটা নিয়ে বারবার সে মাথা ঘামাতে লাগলো, মনে হলো সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু উত্তরটা কিছুতেই ঠিক হলো না।

উল্লসিত হয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমি তোমায় বলিনি!'

কিন্তু জেনিয়া বল্‌লো যে কোথাও না কোথাও ভুল নিশ্চয়ই হচ্ছে আর ভুলটা

বার না করে সে ছাড়বে না। আবার গোড়া থেকে অঙ্কটা সে পরীক্ষা করে দেখলো আর অবশেষে ভুলটা বার করলো।

—এই যে এখানে,—সে বল্‌লো।—সাত সাততে কত হয়, এঁ্যা?

—উনপঞ্চাশ, নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, কিন্তু দেখ তোমরা কত লিখেছো? একুশ!

ভুলটা সে শুধরে দিলো আর সব কিছুই ঠিক মতো মিলে গেল।

—তোমরা অমনোযোগী বলেই এটা ঘটেছে,—বলে সে ইন্‌কুবেটরটার কাছে ফিরে গেল।

আমাদের লেখার খাতায় অঙ্কটা টুকে নিয়ে আমরা রান্নাঘরে ফিরে গেলাম।

—আমরা শেষ করেছি,—আমরা বল্‌লাম।

—ভালো, এবার তোমরা বাইরে একটু বেড়াতে যাও। তাজা হাওয়ায় তোমাদের ভালো হবে।

প্রতিবাদ করে কোনা ফল নেই, তাই মিশ্‌কা আর আমি বেরিয়ে পড়লাম। দিনটা সুন্দর রোদে ভরা। উঠোনে ছেলেরা ভলিবল্‌ খেলছিল, আমরাও যোগ দিলাম। তারপর আমরা কোস্তিয়া দেভিয়াৎকিনের বাড়ী গেলাম আর সেখানে থাকতে থাকতে ভাদিক জাইৎসেভ এসে হাজির হলো আর আমরা চারজনে মিলে সন্ধে পর্যন্ত লটো ও অন্যান্য নানা খেলা খেললাম। আমরা যখন বাড়ী ফিরলাম তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। সোজা আমরা রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম জেনিয়া আর ভিতিয়া ছাড়াও ভানিয়া লোজ্‌কিনও সেখানে রয়েছে। সে বল্‌লো যে সেই রাতের জন্যে ইন্‌কুবেটরটা পাহারা দেবার জন্যে তাকে থাকতে দিতে মাকে সে রাজি করিয়েছে।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এই, এটা আবার কী! এভাবে চল্‌লে আমি আর কোলিয়া কখনোই কিছু করবার সুযোগ পাবো না! আজ রাত্রে ভানিয়া পাহারা দেবে, আর অন্য কেউ কালকে অনুমতি পাবে। না, আমি এতে রাজি নই।'

ভিতিয়া বল্‌লো, 'বেশ বেশ, তোমাদের নামও সময়ের ফর্দে রাখছি যাতে আর সবাইকার মতো তোমরাও পাহারা দিতে পারো।'

আমাদের নাম সে ফর্দের সবচেয়ে নীচে রাখলো।

মিশ্‌কা আর আমি হিসেব করতে লাগলাম আমাদের পালা কখন আসবে, আর দেখা গেল সবচেয়ে ভালো দিনটায়, একুশ দিনের দিন, যেদিন মুরগিছানাগুলোর ডিম ফুটে বেরুবার কথা, সেইদিনে আসবে।

চরম প্রস্তুতি

মিশ্‌কা আর আমি অবশেষে এখন বিশ্রাম পেলাম। সত্যি কথা বল্‌তে কি আমরা দুঃখিত হইনি, কারণ ইন্‌কুবেটরটা আমাদের কাছে একটা বোঝার মত হয়ে উঠেছিল। দিনরাত সেটার কাছে আমাদের থাকতে হতো আর পাছে কোনো ভুল হয় ভেবে এতো ভয় পেতাম যে সব সময়ই সেটার কথা আমরা ভাবতাম। এখন আমাদের বাদ দিয়েও সব কিছুই চমৎকার চলেছে।

ছোটদের প্রাণিতত্ত্ববিদ মণ্ডলীতে আমাদের ভাগের কাজ করতে আমরা সুরু করলাম। দুটো পাখীর বাসা তৈরী করে আমাদের বাগানে ঝুলিয়ে দিলাম, আর আমাদের স্কুলের বাগানে ফুলের বীজ ও অন্যান্য গাছ লাগালাম। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যাপার হোলো এখন আমরা লেখাপড়া করার জন্যে প্রচুর সময় পেতে লাগলাম। আর আমার ও মিশ্‌কার মা যখন দেখলেন যে আমরা ভালো নম্বর পাচ্ছি তখন ইন্‌কুবেটরটা দেখাশোনা করার জন্যে ছেলেরা আমাদের সাহায্য করছে বলে খুসী হলেন।

যখন ছোটদের প্রাণিতত্ত্ববিদ মণ্ডলীর সবাই আমরা একত্রিত হলাম তখন মারিয়া পেত্রোভ্‌না বল্‌লেন মুরগিছানাগুলোর জন্যে কী ভাবে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। তিনি কিছু ঘাস বুনতে উপদেশ দিলেন যাতে তাজা সবুজ কিছু তারা খেতে পায়। তিনি বল্‌লেন সবচেয়ে ভালো হচ্ছে জই বোনা কারণ সেগুলো উপকারী এবং তাড়াতাড়ি বড় হয়।

এখন আমরা আবার কোথা থেকে পোঁতবার জন্যে জই পাই?

ভানিয়া লোজ্‌কিন বল্‌লো, 'পাখীর বাজারে আমাদের যেতে হবে। সেখানে পাখীদের সব রকমের খাবার বিক্রী করে।'

স্কুলের ছুটির পর ভানিয়া আর জেনিয়া গেল পাখীর বাজারে। ঘণ্টা দুই পরে তারা ফিরলো পকেট ভর্তি জই নিয়ে আর জমিয়ে বলার মতো এক গল্প ফেঁদে।

—পাখীর বাজারে কোথাও জই ছিল না। তন্ন তন্ন করে আমরা সমস্ত জায়গা খুঁজলাম আর নানা জাতের জিনিস দেখলাম—শণ, জোয়ার, বার্ডোক বীজ, সব কিছুই শুধু জই ছাড়া। আমরা ভাবছিলাম জই না নিয়েই আমাদের ফিরতে হবে। কিন্তু ঠিক করলাম ফেরার আগে একবার খরগোশগুলোকে দেখে যাই। যখন আমরা খরগোশগুলো দেখছিলাম তখন দেখতে পেলাম একটা ঘোড়া ঝুলি থেকে জই খাচ্ছে। তাই আমরা কিছু জই চাইলাম।

বিস্মিত হয়ে মিশ্‌কা প্রশ্ন করলো, 'কার কাছে চাইলি, ঘোড়াটার কাছে?'

—বোকার মত কথা বলিস না। আমরা ঘোড়ার মালিককেই বল্‌লাম। লোকটি যৌথখামারের চাষী, সে-ই বাজারে খরগোশগুলো এনেছিল। লোকটা ভারি ভালো। সে আমাদের কাছে জানতে চাইলো যে জই নিয়ে আমরা কী করবো আর যখন

তাকে আমরা বল্‌লাম মুরগিছানার জন্যে আমাদের জইয়ের দরকার সে বল্‌লো: 'ওঃ, হো, কিন্তু জই তো মুরগিছানাদের খেতে দেয় না।' কিন্তু তাকে আমরা বল্‌লাম অঙ্কুরের জন্যে গাছ পুঁততে আমরা চাই আর সে বল্‌লো আমাদের যত খুসী তত নিতে পারি। তাই আমরা পকেট বোঝাই করে ফেল্‌লাম।

তক্ষুনি আমরা কাজে লাগলাম আর দুটি নীচু নীচু বাক্স তৈরী করে ফেল্‌লাম। সেগুলোয় মাটী ভরে, জল ঢাল্‌লাম আর পাতলা কাদা মেশালাম।

তারপর আমরা জইগুলো মাটীর ওপর ছড়িয়ে দিয়ে ভালো করে আবার মিশিয়ে দিলাম। বাক্সগুলোকে আমরা উনুনের তলায় রাখলাম যাতে বীজগুলো গরম থাকে।

মারিয়া পেত্রোভ্‌না আমাদের বলেছিলেন যে পাখীর ডিমের মতো গাছের বীজরাও জীবন্ত জিনিস। যতক্ষণ না বীজগুলোকে উষ্ণ ভিজে মাটী জাগিয়ে তোলে আর বড় হতে থাকে ততক্ষণ বীজগুলোর মধ্যে জীবন থাকে ঘুমিয়ে। সব জীবন্ত জিনিসের মতোই বীজও মরে যেতে পারে আর মরা বীজ আর গজায় না।

পাছে বীজগুলো 'মরে' গিয়ে থাকে এই নিয়ে আমরা খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আর ঘন ঘন বাক্সের মধ্যে চাইতে লাগলাম সেগুলো অঙ্কুরিত হচ্ছে কি না দেখবার জন্যে। দুদিন কেটে গেল কিন্তু কোনো লক্ষণই নেই। তৃতীয় দিনের দিন আমরা লক্ষ্য করলাম যে বাক্সের ভেতরকার মাটী এখানে সেখানে ফেটেছে আর জায়গায় জায়গায় মনে হোলো যেন অল্প অল্প ফুলে উঠেছে।

বিরক্ত হয়ে মিশ্‌কা প্রশ্ন করলো, 'এ আবার কী? বাক্সগুলো নিয়ে কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে!'

সেনিয়া বব্‌রোভের সঙ্গে সেদিন লিওশা কুরচ্‌কিন পাহারা দেবার কাজে ছিল। সে বল্‌লো, 'ওধরণের কিছু ঘটেনি।'

মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো, 'তাহলে মাটীটা ওভাবে ফাটলো কি করে? তোমরা নিশ্চয়ই আঙুল দিয়ে খোঁচাচ্ছিলে বীজগুলোকে দেখবার জন্যে।'

সেনিয়া প্রতিবাদ করে বল্‌লো, 'আঙুল দিয়ে কিছুই আমরা খোঁচাইনি!'

এক চাঙড় মাটী আমি তুলে নিয়ে ভেতরকার বীজগুলোকে দেখতে গেলাম। সেটা ফুলে উঠে ফেটে গেছে আর তার ওপর একটা ছোট্ট সাদা অঙ্কুর গজিয়েছে। মিশ্‌কাও একটা বীজ বার করে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলো।

সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, 'আমি জানি কী হয়েছে! ওরা নিজেরাই মাটীটাকে খুঁচিয়ে তুলেছে!'

—কারা ফাটিয়েছে?

—বীজগুলো! তারা জেগে উঠে এখন মাটী ফুঁড়ে উঠে আসছে। দ্যাখো, কী ভাবে মাটীটা ফেঁপে উঠেছে! মাটীর তলায় তাদের আর জায়গা নেই।

মিশ্‌কা দৌড়ে গেল ছেলেদের ডেকে দেখাতে কী ভাবে বীজগুলো বেড়ে উঠেছে। লিওশা আর সেনিয়া আর আমি আরো কয়েকটা বীজ মাটী থেকে বার করে নিলাম। সবগুলোতেই অঙ্কুর গজাতে স্থরু করেছে। দেখতে দেখতে ছেলেরা এসে ঘিরে দাঁড়ালো। প্রত্যেকেই বীজগুলো দেখতে চায়।

ভিতিয়া স্মির্ণোভ বল্‌লো, 'চেয়ে দেখো, বীজগুলো ফেটে যাচ্ছে আর জইগুলো ঠিক মুরগিছানার মতো ফুটে বেরুচ্ছে।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'ঠিক তাই। জইগুলোও জীবন্ত জিনিস, তারা কেবল বেড়ে ওঠে আর একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের মুরগিছানাগুলো যখন ফুটে বেরুবে তখন চারিদিকে দৌড়ে বেড়াবে আর কিচ্ কিচ্ করবে আর খাবার চাইবে। তোমরা দেখো কী রকম আমুদে পরিবার আমাদের হয়!'

সবচেয়ে কঠিন দিন

সবাই মিলে কাজ করার মজা আছে, আর সময়ও তাড়াতাড়ি কাটতে লাগলো। অবশেষে সেই একুশ দিনের দিনটি এসে হাজির হলো। সেটি ছিল শুক্রবার। ছানাগুলোর জন্যে সব কিছুই তৈরী ছিল। গুদামঘর থেকে আমরা একটা বড় পাত্র পেলাম আর নবজাত মুরগিছানাগুলোর জন্যে সেটার ভেতরে ফেল্টের আচ্ছাদন দিয়ে গরম রাখার পাত্র তৈরী করলাম। গরম-জল-ভরা এক পাত্রের ওপর সেটাকে দাঁড় করানো হলো। প্রথম জন্মানো মুরগিছানার জন্যে সেটা অপেক্ষা করতে লাগলো।

মিশ্‌কা আর আমি চেয়েছিলাম আগের রাতটায় জেগে থাকতে। কিন্তু নিজের

মাকে ভাদিক জাইৎসেভ রাজি করিয়েছিল তাকে রাত্রির পাহারার কাজে থাকতে দিতে। আমাদের সেখানে থাকার কথাটা কাণেই তুল্লো না।

সে বল্লো, 'আমি যখন পাহারা দেবার কাজে থাকবো তখন তোমরা যে চারদিকে ঘুর-ঘুর করো তা আমি চাই না। তোমরা শুতে যেতে পারো।'

আমরা বল্লাম, 'কিন্তু যদি রাত্রেই মুরগিছানাগুলো ফুটে বেরুতে থাকে তাহলে কী হবে!'

—হবে আর কী? ছানাগুলো ফুটে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেগুলোকে শুকিয়ে তোলার জন্যে পাত্রের মধ্যে ধপ্ করে ফেলে দেবো।

—'ধপ্' মানে কী?—আমি আতঙ্কিত হয়ে বল্লাম,—খবরদার ফেলো না! খুব সাবধানে ছানাগুলোকে নাড়াচাড়া করা দরকার।

—কিছু ভেবো না, আমি সাবধান হবো। এখন বিছানায় তোমরা শুয়ে পড়ো তো। ভুলো না কাল তোমাদের পাহারা দেবার পালা। তোমাদের তাই ভালো করে ঘুমনো দরকার।

—ভালো কথা,—মিশ্কা রাজি হয়ে গেল।—যদি ছানাগুলো ফুটে বেরুতে আরম্ভ করে তাহলে কিন্তু লক্ষ্মীটী আমাদের জাগিয়ে দিও। এটার জন্যে আমরা এতোদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।

ভাদিক দিব্যি গেলে রাজি হলো।

আমরা বিছানায় শুতে গেলাম বটে, কিন্তু আমি মুরগিছানাগুলোর জন্যে দুর্ভাবনায় অনেকক্ষণ ঘুমতে পারলাম না। পরের দিন খুব সকালে আমার ঘুম ভেঙে গেল আর আমি তক্ষুনি দৌড়োলাম মিশ্কার বাড়ীতে। সেও তখন উঠে পড়েছে আর ইন্‌কুবেটরটার পাশে বসে ডিমগুলোকে পরীক্ষা করে দেখছে।

—আমি তো এখনো কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

ভাদিক বল্লো, 'হয়তো এখনো সময় হবার দেরী আছে।'

তার কিছু পরেই ভাদিক বাড়ী চলে গেল কারণ তখন রাত শেষ হয়েছে আর আমাদের পাহারা দেবার সময় এসেছে। সে চলে যাবার পর মিশ্কা ঠিক করলো আর একবার ডিমগুলো পরীক্ষা করে দেখতে। ডিমগুলোকে উল্টিয়ে ভেতরের

ছানাগুলোর যে ছোট ছোট ফুটো করার কথা সেগুলোকে আমরা খুঁজে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোনো ডিমেই সামান্য চিড় খায়নি। ইন্‌কুবেটরটাকে বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে আমরা বসে রইলাম।

আমি পরামর্শ দিয়ে বল্‌লাম, 'একটা ডিমকে যদি আমরা ভেঙে দেখি তার মধ্যে কোনো ছানা আছে কি না তাহলে কেমন হয়?'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'না, কক্ষোনো দেখতে যাবি না। এখনো সময় হয়নি। ছানাগুলো এখনো খোলার ভেতর দিয়ে নিশ্বেস নিচ্ছে, ফুসফুস দিয়ে নয়। ফুসফুস দিয়ে নিশ্বেস নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা থেকেই খোলাটা ফাটবে। বেশী তাড়াতাড়ি খোলাটা ফাটলে ছানাটা মরে যাবে।'

আমি বল্‌লাম, 'কিন্তু ভেতরে তো তারা জ্যান্তই আছে। হয়তো মন দিয়ে শুন্‌লে শুন্‌তে পাওয়া যাবে ভেতরে সেগুলো নড়ে বেড়াচ্ছে?'

ইন্‌কুবেটরের ভেতর থেকে একটা ডিম বার করে মিশ্‌কা তার কাণের কাছে ধরলো।

আমিও ঝুঁকে পড়ে আমার কাণটা সেটার কাছে নিয়ে এলাম।

মিশ্‌কা চটে বল্‌লো, 'চুপ কর! তুই কাণের কাছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলে আমি কী করে শুন্‌তে পাবো।'

আমি নিশ্বেস বন্ধ করে দাঁড়ালাম। চারিদিক ভারি শান্ত, এতো শান্ত যে টেবিলের ওপরকার ঘড়িটার টিকটিক আওয়াজও শোনা যায়। হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠলো। চম্‌কে উঠে মিশ্‌কা প্রায় ডিমটাকে হাত থেকে ফেলেছিল। আমি দৌড়ে গেলাম দরজাটা খুলতে। দেখি ভিতিয়া এসে হাজির। সে জান্‌তে চাইছে ছানাগুলো ফুটে বেরুতে সুরু করেছে কী না।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'না, এখনো দেরী আছে।'

ভিতিয়া বল্‌লো, 'ভালো কথা, স্কুলে যাবার আগে আবার আমি দেখে যাবো।'

সে চলে গেল আর মিশ্‌কা আবার ডিমটা বার করে তার কাণের কাছে ধরলো। চোখ বন্ধ করে খুব মন দিয়ে শুন্‌তে চেষ্টা করে মিশ্‌কা সে ভাবে অনেকক্ষণ বসে রইলো।

অবশেষে সে বল্‌লো, 'আমি কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।'

আমিও ডিমটা নিয়ে অনেকক্ষণ শুন্‌তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমিও কিছুই শুন্‌তে পেলাম না।

—কি জানি হয়তো ভ্রূণটা মরে গেছে? —আমি বল্‌লাম। —অন্য ডিমগুলোকে আমাদের পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

একটার পর একটা ডিমগুলোকে বার করে সবগুলোকেই আমরা কাণের কাছে ধরে শুন্‌লাম, কিন্তু কোনোটাতেই জীবনের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

—সবগুলোই তো আর মরতে পারে না, পারে কী? —মিশ্‌কা বল্‌লো। —অন্তত একটাও বেঁচে আছে।

আবার ঘণ্টা বাজলো। এবার হাজির হলো সেনিয়া বব্‌রোভ।

আমি প্রশ্ন করলাম, 'এতো সকাল সকাল এসেছো কেন?'

—ছানাগুলো কেমন আছে জানবার জন্যে এসেছি।

উত্তরে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এখনো সেগুলো জন্মায়নি। এখনো সময় হয়নি।'

তারপর এলো সেরিওজা।

—কী খবর, কোনো ছানা ফুটেছে?

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'তোমাদের একেবারেই সবুর সয় না। তোমরা চাও খুব সকাল থেকেই ছানাগুলো ফুটে বেরিয়ে আসুক এখনো প্রচুর সময় আছে।'

সেরিওজা আর সেনিয়া খানিক অপেক্ষা করে চলে গেল। মিশ্‌কা আর আমি আবার ডিমগুলোকে কাণের কাছে এনে শুন্‌তে চেষ্টা করলাম।

করুণ গলায় মিশ্‌কা বল্‌লো, 'না, কোনো লাভ নেই। কোনোরকম সাড়াশব্দ আমি পাচ্ছি না।'

আমি বোঝাতে চাইলাম, 'হয়তো আমাদের বোকা বানাবার জন্যে ওরা চুপ করে আছে।'

—ইতিমধ্যেই তাদের খোলা ভাঙবার কথা।

তারপর এলো যুরা ফিলিপ্পোভ আর স্তাসিক লেভ্‌শিন, আর তাদের পর এলো ভানিয়া লোজ্‌কিন। একজনের পর একজন তারা আসতে লাগলো আর স্কুলে যাবার সময় মনে হলো যেন আমাদের সবাইকে নিয়ে সভা বসেছে। মায়াকে ডেকে আমরা বল্‌লাম আমরা না থাকলে ছানাগুলো যদি বেরোয় তাহলে তাকে কী করতে হবে। তারপর আমরা অন্য সবাইকার সঙ্গে স্কুলে গেলাম।

সেদিনটা কী করে কাটলো আমি জানি না। আমাদের জীবনে সেটাই সবচেয়ে কঠিন দিন ছিল। আমাদের মনে হচ্ছিল যে কেউ যেন ইচ্ছে করে সময়টাকে টেনে বাড়াচ্ছে আর প্রত্যেকটি ক্লাশকেই যেন স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দশগুণ বেশী টেনে লম্বা করছে। আমাদের প্রত্যেকেরই দারুণ ভয় হলো যে স্কুলে থাকার সময় ছানাগুলো ফুটে বেরুবে আর মায়া নিজে সব কিছু সামলাতে পারবে না। শেষের ক্লাশটাই হলো সবচেয়ে খারাপ। আমাদের মনে হলো সেটার বুঝি শেষ নেই। সেটা এতো দীর্ঘ লেগেছিল যে মনে হলো আমরা বুঝি ঘণ্টা শুন্‌তে ভুলে গেছি। তারপর আমাদের মনে হয়েছিল ঘণ্টাটা বুঝি খারাপ হয়ে গেছে কিম্বা দারোয়াণী খুড়ি দুনিয়া শেষের ঘণ্টাটা বাজাতে ভুলে গিয়ে বাড়ী চলে গেছেন আর আমাদের কাল সকাল পর্যন্ত স্কুলে থাকতে হবে।

ক্লাশশুদ্ধু সবাই আড়ষ্ট হয়ে ভয় পেতে লাগলাম। সবাই আমরা জেনিয়া স্কভরৎসোভের কাছে ছোট ছোট কাগজের টুকরো পাঠাতে লাগলাম সময়টা জানবার জন্যে। কিন্তু এমনই কপাল যে জেনিয়া সেইদিনই ঘড়িটা বাড়ীতে ফেলে এসেছিল। ক্লাশের ভেতরে এতো গোলমাল সুরু হলো যে শান্ত হওয়ার অনুরোধ করার জন্যে আলেক্সান্দ্র্‌ এফ্রেমভিচকে কয়েকবার থামতে হলো। কিন্তু গোলমাল বেড়েই চল্‌লো। শেষ পর্যন্ত মিশ্‌কা তার হাত তুলে জানাতে চাইলো যে পড়াশুনোর কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘণ্টাটা আবার বাজলো আর সবাই দৌড়োলো দরজাটার দিকে। আলেক্সান্দ্র্‌ এফ্রেমভিচ আমাদের সবাইকে আবার বসিয়ে বল্‌লেন যে মাষ্টারমশাই ঘর থেকে না গেলে কারুর পক্ষেই ডেস্ক ছেড়ে ওঠা উচিত নয়। তারপর তিনি মিশ্‌কাকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন:

—তুমি আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইছিলে?

—না না, আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম যে পড়া শেষ হয়েছে।

—কিন্তু তুমি তো ঘণ্টা বাজবার আগেই হাত তুলেছিলে, নয় কী?

—আমি ভেবেছিলাম ঘণ্টাটা খারাপ হয়ে গেছে।

মাথা নেড়ে আমাদের নাম ডাকার খাতাটাকে তুলে নিয়ে আলেক্সান্দ্র্ এফ্রেমভিচ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরা সবাই এক দৌড়ে বারান্দায় পৌঁছে সিঁড়ি দিয়ে নামতে স্রুরু করলো। বেরুবার পথটা ভিড় হওয়া সত্ত্বেও মিশ্‌কা আর আমি কোনো রকমে বেরিয়ে এলাম। আমরা পথের দিকে দৌড় দিলাম, আর সবাই হন্তদন্ত হয়ে আমাদের পিছন পিছন দৌড়োতে স্রুরু করলো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা বাড়ী পৌঁছুলাম। তার পুতুল জিনায়িদার জন্যে নতুন একটা পোষাক সেলাই করতে করতে মায়া পাহারায় বসে ছিল।

—কিছু ঘটেছে কী? —আমরা প্রশ্ন করলাম

—কিছু না।

—কতক্ষণ আগে তুই ইন্‌কুবেটরটাকে দেখেছিলি?

—সেতো অনেকক্ষণ আগেই। তখন তো আমি ডিমগুলোকে একবার উল্টে দিয়েছিলাম।

মিশ্‌কা ইন্‌কুবেটরটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। ডিঙি মেরে সব ছেলেরা গলা বার করে ভিড় করে দাঁড়ালো। ভানিয়া লোজ্‌কিন ভালো করে দেখার জন্যে একটা চেয়ারে উঠে পড়ে গিয়ে লিওশা কুরচ্‌কিনকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ছিট্‌কে ফেলেছিল। মিশ্‌কা কিন্তু ইতস্ততঃ করতে লাগলো ঢাক্‌নিটা খুলতে। দেখতে সে ভয় পাচ্ছিল।

দলের কেউ একজন বললো, 'চলে এসো, খুলে ফেল। কী জন্যে তুই অপেক্ষা করছিস?'

অবশেষে মিশ্‌কা ঢাক্‌নিটা খুলে ফেল্‌লো। বড় বড় শাদা পাথরের নুড়ির মত আগে যেরকম পড়েছিল ডিমগুলোকে সেরকমই দেখাতে লাগলো। কিছুক্ষণ ধরে নিরুত্তর হয়ে মিশ্‌কা দাঁড়ালো তারপর সে ডিমগুলোকে একটার পর একটা সযত্নে উল্টে চারদিক পরীক্ষা করলো।

কাতর কণ্ঠে সে বল্‌লো, 'কোথাও একটা ফাটল নেই।'

দোষ দেবে কাকে?

ছেলেরা নিঃশব্দে ঘিরে দাঁড়ালো।

সেনিয়া বব্‌রোভ বল্‌লো, 'হয়তো কোনো দিনই ডিমটা ফুটবে না। তোমাদের কী মনে হয়, এ্যাঁ?'

মিশ্‌কা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো:

—আমি কেমন করে বল্‌বো? আমি তো তা দেওয়া মুরগি নই! তা দেওয়ার ব্যাপারে আমি কী জানি?

প্রত্যেকেই একসঙ্গে কথা বলতে সুরু করলো, কেউ কেউ বল্‌লো কখনোই বাচ্চা ফুটে বেরুবে না, কেউ কেউ বল্‌লো হয়তো এখনো ফুটে বেরুতে পারে, আর

বাকি সবাই বল্‌লো বেরুতেও পারে না বেরুতেও পারে। অবশেষে ভিতিয়া স্মির্ণোভ সমস্ত বাদ-প্রতিবাদ থামিয়ে দিল।

সে বল্‌লো, 'নিশ্চয়ই কোরে এতো তাড়াতাড়ি কিছুই বলা যায় না। এখনো দিনটা শেষ হয়নি। আগের মতই আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আর এখন যাদের কাজ আছে তারা ছাড়া আর সবাই পালাও।'

ছেলেরা সব বাড়ী ফিরে গেল। কেবল মিশ্‌কা আর আমি রইলাম। আর একবার ডিমগুলো নিয়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করলাম কোনো জায়গায় সামান্যও চিড় খেয়েছে কি না কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না। মিশ্‌কা ঢাকাটা বন্ধ করে দিল।

—ঠিক আছে, যা কিছুই ঘটুক না কেন আমি গ্রাহ্য করি না! যাই হোক, এতো তাড়াতাড়ি ঘাবড়ালে চলবে না, বিকেল পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো আর তখনো কিছু না ঘট্‌লে আমরা ভাবতে স্থরু করতে পারি।

আমরা ঠিক করলাম দুর্ভাবনা করবো না আর ধৈর্য ধরে রইলাম অপেক্ষা করতে। কিন্তু সেটা বল্‌তে যত সহজ কাজে তত নয়। যতই কেন না আমরা চেষ্টা করি দুর্ভাবনা না করে আমরা পারলাম না। প্রত্যেক দশ মিনিট ছাড়া ছাড়া ইন্‌কুবেটরের ভেতরে আমরা উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলাম। অন্য ছেলেদেরও দুর্ভাবনা হয়েছিল। খবর নেবার জন্যে তারা আসতে লাগলো। প্রত্যেকের মুখে একই প্রশ্ন:

—কী হলো, কেমন চলছে?

খানিক পর থেকে মিশ্‌কা উত্তর দেওয়া বন্ধ করলো আর কেবলই কাঁধ ঝাঁকিয়ে চল্‌লো। কিন্তু এত ঘন ঘন তাকে কাঁধ ঝাঁকাতে হচ্ছিল যে দিনের শেষে তার কাঁধ দুটো প্রায় কাণে এসে ঠেকলো।

সন্ধে পার হবার পর থেকে ছেলেরা আসা থামালো। সব শেষে এলো ভিতিয়া। আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ সে বসে রইলো।

—হয়তো তোমরা হিসেবে ভুল করেছো?—সে প্রশ্ন করলো।

আমরা আবার গুণতে স্থরু করলাম কিন্তু কোনো ভুল পেলাম না। আজই হচ্ছে একুশ দিনের দিন আর সেটা শেষ হতে চলেছে। তবুও মুরগিছানার দেখা নেই।

আমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে ভিতিয়া বল্‌লো, 'কুছ পরোয়া নেই। সকাল পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। রাত্রের মধ্যে তারা হয়তো ফুটে বেরুবে।'

মিশ্‌কার বাড়ীতে রাতের জন্যে থাকতে দিতে মাকে আমি রাজি করালাম আর আমরা স্থির করলাম সমস্ত রাত জেগে বসে পাহারা দেবো।

অনেকক্ষণ ধরে ইন্‌কুবেটরের পাশে নিঃশব্দে আমরা বসে রইলাম। আর কিছুই আমাদের কথা বলার রইলো না। আমরা এমন কি আকাশ-কুসুমও রচনা করতে পারলাম না কারণ আমাদের সমস্ত আশাই ভেঙে চুরমার হয়েছে। খানিক পরেই ট্রামগুলো থামলো আর চারিদিক ভারি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। জানালার বাইরেকার রাস্তার বাতিটা নিভলো। আমি সোফাটায় শুয়ে পড়লাম। মিশ্‌কা বসে বসে ঢুলতে লাগলো। কিন্তু চেয়ার থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হওয়ায় সে উঠে এসে সোফার ওপর আমার পাশে শুয়ে পড়লো। আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন আমাদের ঘুম ভাঙলো তখন দিনের আলো হয়ে গেছে আর আগেকার মতোই সব কিছু একই ভাবে রয়েছে। তখনো ইন্‌কুবেটরের মধ্যে ডিমগুলো রয়েছে। তাদের কোনোটাতেই এতোটুকু ফাটল ধরেনি আর ভেতরেও সাড়াশব্দ নেই।

সব ছেলেরাই দারুণ হতাশ হয়ে পড়লো।

—কী ঘটে থাকতে পারে?—তারা প্রশ্ন করলো।—আমরা তো সব রকম নির্দেশই খুব যত্ন কোরে মেনে গিয়েছি, যাইনি কী?

ঘাড় ঝাঁকিয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমি জানি না।'

আমি কেবল জানি কী ঘটেছে। আমি যেবার বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সেবারই নিশ্চয়ই ভ্রূণগুলো মরে গেছে। তাপটা নেবে গিয়েছিল আর ঠাণ্ডায় সেগুলো গিয়েছিল মরে—তারা মরে গিয়েছিল তাদের জীবন ঠিক মতো সুরু হবার আগেই। সবাইকার কাছে আমাকে ভারি অপরাধী বলে মনে হতে লাগলো। তাদের সমস্ত কষ্ট বৃথা হতে চলেছে আর সেটা কেবল আমার জন্যে! কিন্তু ঠিক তখনোই কথাটা তাদের বলতে পারলাম না। পরে সমস্ত ঘটনাটা যখন সবাই ভুলে যাবে আর মুরগিছানাগুলো হারানোর জন্যে তাদের মনে অতো আর কষ্ট থাকবে না তখন আমি দোষ স্বীকার করবো বলে স্থির করলাম।

সেদিন স্কুলে সবাই আমরা খুব মনমরা হয়েছিলাম। এতো সমবেদনা নিয়ে সব ছেলেরা আমাদের দিকে তাকাতে লাগলো যে মনে হলো আমরা যেন কারুর মৃত্যুতে শোকার্ত। এবং সেনিয়া বব্‌রোভ যখন তার অভ্যেস মতো আমাদের 'আদুরে ছানা' বলে ডাকতে সুরু করলো অন্যরা তার ওপর তেড়ে গিয়ে বল্‌লো তার লজ্জিত হওয়া উচিত। মিশ্‌কা ও আমার খুব অস্বাস্ত হতে লাগলো।

—এর চেয়ে ওরা আমাদের ধম্‌কালে খুসী হতাম!—মিশ্‌কা বল্‌লো।

—কেন তারা ধম্‌কাতে যাবে?

—ভেবে দেখ আমাদের জন্যে কত ওরা খেটেছে। ওরা অসন্তুষ্ট হতেই পারে।

স্কুলের ছুটির পর কয়েকজন ছেলে আমাদের বাড়ীতে এলো কিন্তু শীগ্‌গিরই আসা বন্ধ করলো। শুধু কোস্তিয়া দেভিয়াৎকিন ছাড়া। সে দু'একবার এসেছিল। সেই তখন একমাত্র যে আশা ছাড়েনি।

আমাকে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'দেখলি তো! সব ছেলেরাই এখন আমাদের ওপর চটেছে। কিন্তু আমি জানতে চাই তারা কেন আমাদের ওপর চটবে? যে কেউই তো বিফল হতে পারে।'

—কিন্তু তুই তো বলেছিলি ওদের চটবার অধিকার আছে।

চটে উঠে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'তা তো আছেই। আর সেরকম অধিকার তোরও আছে। সবটাই আমার দোষ আমি জানি।'

—তোর দোষ কেন? তোকে তো কেউই কোনো কিছুর জন্যে দোষ দিচ্ছে না। তোর একেবারেই দোষ নেই,—আমি বল্‌লাম।

—হ্যাঁ, আমারই দোষ। কিন্তু তুই তো আমার ওপর খুব বেশী চট্‌বি না, চট্‌বি কী?

—আমি চটতে যাবো কেন?

—কারণ আমি একেবারেই অপদার্থ। আমার কপালটাই খারাপ, যা কিছুই আমি করি না কেন কোনো ফলই হয় না।

—ও কথা সত্যি নয়। আমিই সব কিছু নষ্ট করি,—আমি বল্‌লাম।—সবটাই আমার দোষ।

—না, তা নয়। আমারই দোষ। আমিই মুরগিছানাগুলোকে মেরেছি।

—কি কোরে তোর পক্ষে সেগুলোকে মারা সম্ভব?

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'তোকে বলছি কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর তুই খুব বেশী চট্‌বি না।—একবার খুব ভোরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর যখন ঘুম ভাঙলো তখন থারমোমিটারটার দিকে চেয়ে দেখি সেটা ১০৪ ডিগ্রীতে উঠে গেছে। ডিমগুলোকে ঠাণ্ডা করার জন্যে চট্‌ কোরে ডালাটা খুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে তখনই খুব দেরা হয়ে গিয়েছিল।'

—কবে সেটা ঘটেছিল?

—পাঁচদিন আগে।

মিশ্‌কাকে ভারি অপরাধী ও করুণ দেখাতে লাগলো।

—তোর দুর্ভাবনা করার দরকার নেই,—আমি তাকে বল্‌লাম। তার অনেকদিন আগেই ডিমগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

—কিসের আগে?

—তুই বেশী ঘুমিয়ে পড়ার আগেই।

—কে সেগুলোকে নষ্ট করেছিল?

—আমি করেছিলাম।

—তুই? কী কোরে?

—আমিও বেশী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর তাপটা নেমে গিয়েছিল আর ডিমগুলো গিয়েছিল নষ্ট হয়ে।

—কবে সে ঘটনা ঘটে?

—দশ দিনের দিন।

—আগে তুই কিছু বলিসনি কেন?

—স্বীকার করতে আমার ভয় হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম হয়তো মুরগিছানা-গুলো শেষ পর্যন্ত মরেনি, কিন্তু এখন আমি জানি সেগুলো মরে গিয়েছিল। আমিই সেগুলোকে মেরে ফেলেছি।

—আর তুই বিনা কারণে ছেলেগুলোকে এতো খাটালি,—আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো,—কেবল তোর স্বীকার করতে ভয় হচ্ছিল বোলে।

—আমি ভেবেছিলাম হয়তো ঠিকই আছে। আর ছেলেরা যদি জানতে পারতো ব্যাপারটা, তাহলেও কাজটা চালিয়ে যেতো, যাতে জানতে পারে ভ্রূণগুলো নষ্ট হয়েছে কি না।

বিরক্তির সঙ্গে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'ও, তারা কাজ চালিয়ে যাবে বোলে ঠিক করেছিল, না! যাই হোক তোর তখনই স্বীকার করা উচিত ছিল। তাহলে প্রত্যেকের হয়ে তোর কর্তব্য স্থির করার বদলে আমরা সবাই মিলে স্থির করতে পারতাম।'

আমি বল্‌লাম, 'দ্যাখ, ভালো হচ্ছে না বলছি। আমার ওপরে কী কারণে চোট-পাট করছিস? তুই নিজে কেন স্বীকার করিসনি? তুইও তো ঘুমিয়ে পড়েছিলি, পড়িসনি কি?'

অনুতপ্ত হয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'হ্যাঁ, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি নিশ্চয়ই একটা শূয়োর। ইচ্ছে হলে আমার নাকে একটা ঘষি মারতে পারিস।'

আমি বল্‌লাম, 'ওরকম কিছুই আমি করবো না। কিন্তু দেখিস ছেলেদের সেকথা বলিস না যেন।'

—কালকেই তাদের আমি বল্‌বো। তোর কথা নয়, আমার কথা। সবাই তারা জানুক আমি কী রকম একটা শূয়োর। সেটাই আমার শাস্তি হবে।

আমি বল্‌লাম, 'ভালো কথা, আমিও তাহলে স্বীকার করবো।'

—না, তোর না করাই ভালো।

—কেন নয়?

—তুই তো ওদের জানিস। আমরা সব কাজ একসঙ্গে করি বলে ওরা আমাদের সর্বদা ঠাট্টা করে। আমরা স্কুলে যাই একসঙ্গে, পড়া তৈরী করি একসঙ্গে, এমন কি একসঙ্গে কম নম্বরও পাই। এবার তারা বলবে পাহারা দেবার সময়ও আমরা একসঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আমি বল্‌লাম, 'তাদের যা খুসী তারা বলুক। তাছাড়া তোকে ওরা ঠাট্টা করবে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখবো তা আমি পারবো না, পারি কী?'

যখন সব আশা নিভে গেলো

সেই করুণ দিন শেষ হলো আর আবার হলো সন্ধে। রান্নাঘরের ভেতরকার অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই: ইন্‌কুবেটরটা গরম রয়েছে, বাতিটাও তখনও জ্বলছে, কিন্তু আমাদের আশা গেছে মরে। তার হাতের ডিমটার দিকে তাকিয়ে মিশ্‌কা চুপ করে বসে রইলো। আমরা মনস্থির করতে পারলাম না সেটাকে ফাটিয়ে দেখবো না আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবো। অকস্যাৎ মিশ্‌কা চম্‌কে খাড়া হয়ে বসলো আর আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকালো। আমার মনে হলো আমার পিছনে বোধ হয় সে কোনো ভূত দেখেছে। তাই আমি চট্‌ কোরে ফিরে তাকালাম। কিন্তু সেখানে কিছু ছিল না। আবার মিশ্‌কার দিকে ফিরলাম।

—দ্যাখ, দ্যাখ!—ডিম শুদ্ধ হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে ভাঙা গলায় সে বল্‌লো।

প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, কিন্তু তারপর একটা জায়গায় ফাটল ধরার মতো কি যেন রয়েছে লক্ষ্য করলাম।

—কোনো কিছুর সঙ্গে কি এটার ঠোক্কোর লাগিয়েছিস?

মিশ্‌কা মাথা নাড়ালো।

—তাহলে—তাহলে—মুরগিছানাটা করেছে?

মিশ্‌কা মাথা নাড়িয়ে হঁ্যা বল্‌লো।

—তুই কি একেবারে নিশ্চিত?

মিশ্‌কা ঘাড় ঝাঁকালো।

—জানি না…

ডিমের ওপর ছোট্ট একটি গর্ত করে আমি সেই ভাঙা খোলার অংশটুকু নখ দিয়ে সাবধানে ছাড়িয়ে দিলাম।

সেই মুহূর্তে ছোট্ট হলদে একটি ঠেঁাট গর্তের ভিতর দিয়ে বেরিয়েই মিলিয়ে গেল।

আমরা এতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম যে কথা বলতে পারিনি। আনন্দে শুধু দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম।

—হুররে! কি অদ্ভুত কাণ্ড!—চিৎকার কোরে মিশ্‌কা হাসিতে ফেটে পড়লো।—এখন কোথায় আমরা দৌড়ে যাবো? কোথায় যাবো প্রথম?

আমি বল্‌লাম, 'এক মিনিট সবুর কর! এতো তাড়াহুড়োর দরকার কি? তুই চল্‌লি কোথায়?'

দৌড়ে দরজার দিকে যেতে যেতে সে বল্‌লো, 'দৌড়ে গিয়ে ছেলেদের জানানো দরকার!'

আমি বল্‌লাম, 'থাম! আগে ডিমটাকে রেখে দে। আশা করি ওটাকে তুই তোর সঙ্গে নিয়ে যেতে চাস না।'

মিশ্‌কা ফিরে এসে ইন্‌কুবেটরের মধ্যে ডিমটাকে রেখে দিল। সেই মুহূর্তে কোস্তিয়া এসে পৌঁছুলো।

মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, 'ইতিমধ্যেই আমরা একটা মুরগিছানা পেয়েছি!'

—তুই ধাপ্পা দিচ্ছিস!

—সত্যি বলছি!

—কোথায় সেটা?

—এই যে এখানে!

মিশ্‌কা ইন্‌কুবেটরের ডালাটা তুলে ধরলো আর কোস্তিয়া দেখতে লাগলো ভেতরটা।

—মুরগিছানাটা কোথায়? আমি তো শুধু ডিমগুলোই দেখছি।

চিড়-খাওয়া-ডিমটা কোথায় সে যে রেখেছে তা মিশ্‌কা ভুলে গিয়েছিল। এখন সেটাকে সে খুঁজে পেলো না। অবশেষে হঠাৎ সে খুঁজে পেলো আর বিজয়ী ভঙ্গিতে কোস্তিয়াকে দেখালো।

আনন্দে কোস্তিয়া চিৎকার করে উঠলো:

—দেখ দেখ, সত্যিকারের একটা মুরগিছানার ঠোঁট এটার ভেতর থেকে বেরিয়ে রয়েছে!—সে চেঁচিয়ে উঠলো।

—নিশ্চয়ই এটা সত্যি। তুই কি ভেবেছিলি এটা কোনো সার্কাসের খেলা, না অন্য কিছু?

—তোমরা অপেক্ষা করো। ডিমটার কাছে তোমরা থাকো আর আমি গিয়ে অন্য সবাইকে ডেকে আনছি; —কোস্তিয়া বল্‌লো।

—বেশ বেশ, যাও গিয়ে ডেকে আনো। তারা কেউ বিশ্বাস করেনি যে কোনো মুরগিছানাই জন্মাবে। সমস্ত সন্ধে ধরে কেউই আসেনি।

—ওখানেই তোমরা ভুল করছো। তারা সবাই আমার বাড়ীতে এসেছে আর তারা সবাই বিশ্বাস করে মুরগিছানা জন্মাবে। কিন্তু তোমাদের বিরক্ত করতে তারা ভয় পায়। তাইতে তারা আমাকে পাঠিয়েছে সব কিছু কী রকম চলছে দেখবার জন্যে।

—ওরা ভয় পেয়েছিল কেন?

—ওরা জানে তোমাদের কী রকম মন খারাপ হয়ে গেছে। তাই তারা তোমাদের বিরক্ত করতে চায় না।

কেস্তিয়া দৌড়ে বাইরে গেল আর সিঁড়ির ওপর তার পায়ের শব্দ আমরা শুনতে পেলাম। তিনটে কোরে সিঁড়ি সে একসঙ্গে লাফিয়ে নামছে।

মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে! এখনো আমার মাকেই যে বলিনি!'

সে তার মাকে ডাকতে গেল আর আমি ডিমটা ছোঁ মেরে নিয়ে আমার মাকে দেখাবার জন্যে দৌড় দিলাম।

মা সেটাকে দেখেই আমাকে বল্‌লেন দৌড়ে গিয়ে তক্ষুনি সেটাকে ইন্‌কুবেটরের মধ্যে রাখতে, কারণ না হলে সেটা ঠাণ্ডা হয়ে আসবে আর মুরগিছানাটার ঠাণ্ডা লাগবে।

দৌড়ে আমি মিশ্‌কার বাড়ীতে গেলাম। রান্নাঘরের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় সে ছিল আর তার মা ও বাবা সেখানে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। আমাকে দেখেই মিশ্‌কা ঝাঁপিয়ে পড়লো:

—ডিমটাকে কোথায় রেখেছি দেখেছিস? সমস্ত ইন্‌কুবেটরটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু সেটাকে কোথাও খুঁজে পাইনি।

—173

—কোন ডিমটা?

—তুই তো জানিস··· যেটার মধ্যে ছানাটা ছিল!

আমি বল্‌লাম, 'এই তো এইখানে রয়েছে।'

আমার হাতের মধ্যে ডিমটা দেখে মিশ্‌কা প্রায় ভিমি গেল।

—বোকা গাধা কোথাকার! ডিমটাকে নিয়ে চারদিকে দৌড়ে বেড়াবার মানে কী!

মিশ্‌কার মা বল্‌লেন, 'চুপ চুপ, একটা ডিম নিয়ে কী হ্যাঙ্গামা বাধিয়েছিস।'

—মা, চেয়ে দেখো! এটাতো আর সাধারণ একটা ডিম নয়।

মিশ্‌কার মা ডিমটা নিয়ে গর্তের ভেতর দিয়ে বেরুনো ছোট্ট ঠোঁটটার দিকে তাকালেন। তার বাবাও তাকালেন।

—হুম,—হেসে তিনি বল্‌লেন,—অদ্ভুত তো!

ভারিক্কি চালে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এর মধ্যে অদ্ভুত কিছুই নেই। এটা একটা সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা।'

হেসে মিশ্‌কার বাবা বল্‌লেন, 'তুই নিজেই একটা সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা। মুরগিছানাগুলো সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশ্চর্য হবার কথা হচ্ছে এই যে তোদের ইন্‌কুবেটরের মধ্যে ওগুলো জন্মেছে। এটা দিয়ে কিছু যে একটা হবে সেটা তো আমি ভাবিইনি।'

—তখন তুমি একথা বলোনি কেন?

—কেন আমি বল্‌বো? রাস্তায় রাস্তায় পাগলের মতো দৌড় ঝাঁপ করার চেয়ে মুরগিছানা ফোটানোর কাজে তোরা ব্যস্ত থাকিস, এই আমি চেয়েছিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে মায়া রান্নাঘরে ঢুকলো। ঠিক তখুনি বিছানা ছেড়ে সে উঠেছে, জামাকাপড় তার উল্টা-পাল্টা, আর তার খালি পায়ের ওপর জুতো পরা। সে শুয়ে পড়েছিলো, কিন্তু মুরগিছানার কথা শুনে সেটাকে দেখবার তার ইচ্ছে হোলো। তাই সে কোনো রকমে জামাকাপড় পরে উঠে এসেছে। দু'এক মিনিট ধরে তাকে ডিমটা আমরা ধরতে দিলাম। ফুটোটার কাছে সে চোখ নিয়ে গেল আর সেই মুহূর্তেই মুরগিছানাটা তার ঠোঁট বার করলো।

মায়া আর্তনাদ করে উঠলো, ‘ওটা আমাকে ঠোকরাতে চায়! ওরে দুষ্টু মুরগিছানা! খোলস না ছেড়েই এখুনি লড়াই করতে এসেছিস।’

মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘সবে জন্মানো মুরগিছানাকে ধম্‌কাতে নেই! ওকে তুই ভয় পাইয়ে দিবি।’

ডিমটা নিয়ে ইন্‌কুবেটরের মধ্যে সে রেখে দিল।

সেই মুহূর্তে বাইরের সিঁড়িতে সোরগোল উঠলো আর শোনা গেল দৌড়বার আওয়াজ। দেখতে দেখতে রান্নাঘরটা ছেলের দলে ভরে গেলো। আবার ডিমটাকে বার করে সবাইকে দেখাতে হলো।

সবাই চায় ফুটোর মধ্যে দিয়ে মুরগিছানাটাকে দেখতে।

—বন্ধুগণ,—মিশ্‌কা চেঁচিয়ে বল্‌লো।—ডিমটাকে আমাদের ফিরিয়ে দাও। ইন্‌কুবেটরের মধ্যে ওটাকে আবার রাখতে হবে, নইলে মুরগিছানাটার ঠাণ্ডা লাগবে।

কিন্তু তার কথায় কেউই কাণ দিলো না।

ডিমটাকে আমাদের ছিনিয়ে নিতে হলো।

ভিতিয়া প্রশ্ন করলো, ‘অন্য কোনো ডিমগুলোয় চিড় ধরেনি?’

অন্য ডিমগুলোকে আমরা পরীক্ষা কোরে দেখলাম কিন্তু কোনোটাতেই চিড় ধরেনি।

মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘না, শুধু ৫ নম্বরটাতেই ধরেছে। অন্যগুলোয় কোনো চিড় ধরার চিহ্ন নেই।’

ছেলের দল বল্‌লো, ‘পরে হয়তো ওগুলো থেকে মুরগিছানা ফুটে বেরুবে।’

মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘তাতে কিছু যায় আসে না। শুধু একটা মুরগিছানা ফুটে বেরুলেই খুসী হবো। তাহলেই অন্তত বুঝবো যে আমাদের অতো পরিশ্রম নিরর্থক হয়নি।’

সেনিয়া বব্‌রোভ বল্‌লো, ‘খোলাটাকে ভেঙে মুরগিছানাটাকে বার কোরে দেওয়া আমাদের উচিত নয় কি? ওর মধ্যে বসে থাকতে ওটার নিশ্চয়ই অস্বাস্ত হচ্ছে।’

মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘না না, খোলাটা কেউ ছুঁবি না। মুরগিছানাটার চামড়া এখনো খুব কোমল, ছুঁলে হয়তো লেগে যেতে পারে।’

বেশ খানিকটা পরে ছেলেরা চলে গেল।

6*

সবাই চাইছিল খোলা থেকে যখন মুরগিছানাটা বেরিয়ে আসবে তখন থাকতে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক রাত হয়ে গেছে। তাই তাদের বাড়ী যেতেই হোলো।

—কুছ পরোয়া নেই,—মিশ্‌কা বল্‌লো।—এটাই একটা ছানা নয়, তোরা দেখিস শীগ্‌গিরই অন্য ছানাগুলোও ফুটে বেরুবে।

ছেলের দল ফিরে যাবার পর মিশ্‌কা ডিমগুলোকে আর একবার পরীক্ষা করে দেখলো আর আবিষ্কার করলো আর একটা ফাটার দাগ।

চেঁচিয়ে সে বল্‌লো, 'দ্যাখ, দ্যাখ! ১১ নম্বরটাও ফুটে বেরিয়ে আসছে!'

আমি দেখলাম বাস্তবিকই যে ডিমটার ওপর '১১' লেখা সেটার গায়ে চিড় ধরেছে।

আমি বল্‌লাম, 'ছেলের দল সবাই চলে গেছে, কী দুঃখের কথা। এখন আর তাদের দৌড়ে গিয়ে ধরা যাবে না।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'বাস্তবিক দুঃখের কথা বই কি! কিন্তু ভাবিস না, কালকেই তারা দেখবে ডিম থেকে ফুটে বেরুনো মুরগিছানাগুলোকে।'

আনন্দে প্রায় ফেটে পড়ে আমরা ইন্‌কুবেটরটার পাশে বসে রইলাম।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'তোর আর আমার কপালই সবচেয়ে ভালো। বাজি ফেলে বলতে পারি আমাদের মতো কপাল খুব কম লোকেরই হয়।'

রাত্রি হলো।

আর সবাই ঘুমতে গেছে। কিন্তু মিশ্‌কার আর আমার চোখে এতটুকু ঘুম নেই।

খুব তাড়াতাড়ি সময় কাটতে লাগলো। রাত্র প্রায় দুটোর সময় আরো দুটো ডিম ফাটলো: ৮ আর ১০ নম্বরটা। আর তার পরের বার আমরা যখন ইন্‌কুবেটরটার ভেতর দেখলাম তখন বাস্তবিকই আমাদের জন্যে একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। ডিমগুলোর মধ্যে নবজাত একটি মুরগিছানা বসে ছিল। সেটা চেষ্টা করছিল পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে, কিন্তু ক্রমাগতই টোলে টোলে পড়ছিল।

আনন্দে আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে এলো।

মুরগিছানাটাকে আমি তুলে নিলাম। তখনো সেটা ভিজে ছিল। আর পালকের বদলে তার নরম লালচে পিঠের সর্বত্র রেশমের মত হলদে রোঁয়া এলোমেলো ভাবে আটকে ছিল।

গরম রাখার পাত্রটা মিশ্‌কা খুল্‌লো আর আমি মুরগিছানাটাকে ভেতরে রেখে দিলাম। সেটা যাতে গরম থাকে সেইজন্যে নীচের পাত্রে গরম জল ঢাললাম।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'ভেতরটা খুব গরম। শীগ্‌গিরই ওটা শুকিয়ে গিয়ে সুন্দর পেঁজা তূলোর মত দেখতে হবে।'

ইন্‌কুবেটরের ভেতর থেকে খোলার দুটো ভাগ সে তুলে নিলো।

—অতটুকু খোলাটার মধ্যে এতো বড়ো ছানাটা কী করে ছিল ভাবতেই অবাক লাগে!

আর বাস্তবিকই খোলাটার তুলনায় ছানাটাকে মস্তবড় দেখাচ্ছিল। কিন্তু আসলে সেটা পাগুলো গুটিয়ে মাথাটা নীচু করে গুটিসুটি মেরেছিল। এখন সেটা ঘাড় মেলে তার সরু সরু পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভাঙা খোলাটার দিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো:

—দ্যাখ, দ্যাখ, এটা ভুল ছানা!

—বলিস কী? 'ভুল ছানা' মানে?

—এটা এক নম্বরেরটা নয়! প্রথম যে ডিমটা ফেটেছিল তার নম্বর ছিল ৫, এটার নম্বর ১১।

বাস্তবিকই খোলাটার ওপর ১১ লেখা ছিল।

ইন্‌কুবেটরটার ভেতরে আবার আমরা তাকালাম। যেখানে ৫ নম্বরটাকে আমরা রেখেছিলাম সেখানেই সেটা রয়েছে।

—এটার হোলো কী?—আমি বল্‌লাম।—সব প্রথম এটাই খোলাটা ভেঙেছিল অথচ এখনো ওটা বেরিয়ে আসছে না!

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'হয়তো ওটা এতো দুর্বল যে নিজে থেকে খোলাটা ভাঙতে পারছে না। আরো কিছুক্ষণ ওটাকে ওভাবে থাকতে দেওয়া যাক, হয়তো তাহলে ওর গায়ের জোর বাড়বে।'

আমাদের ভুল

আমরা এতো ব্যস্ত ছিলাম যে সকাল যে হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি যতক্ষণ না জানালার ওপর রোদ্দুর এসে পড়লো। রান্নাঘরের মেঝেয় হাসিখুসি রশ্মিগুলো খেলা করতে লাগলো। ঘরটা উজ্জ্বল আর প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'তুই দেখিস, ছেলেরা শীগ্‌গিরই আসবে। তারা ধৈর্য ধরতে পারবে না।'

তার মুখ থেকে কথাগুলো বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের দলের দুজন এসে হাজির হলো। জেনিয়া আর কোস্তিয়া।

—অদ্ভুত কাণ্ড একটা দেখতে চাস?—চেঁচিয়ে উঠে গরম রাখার পাত্র থেকে নবজাত মুরগিছানাটাকে মিশ্‌কা তুলে নিলো।—এই দেখ! প্রকৃতির অদ্ভুত কাণ্ড।

গম্ভীর মুখে ছেলেরা ছানাটাকে পরীক্ষা করতে লাগলো।

বুক ফুলিয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আরো তিনটে ডিম ফেটেছে। এই দ্যাখ, ৫, ৮ আর ১০ নম্বরেরটা।'

স্পষ্টই বোঝা গেল মুরগিছানাটা ঠাণ্ডা পছন্দ করছে না। আমরা যখন সেটাকে হাতে করেছিলাম সেটা ছট্‌ফট করছিল, কিন্তু যেই আমরা পাত্রের মধ্যে রেখে দিলাম সেটা শান্ত হয়ে এলো।

কোস্তিয়া প্রশ্ন করলো, 'ওটাকে তোরা খাইয়েছিস?'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'না না। এতো তাড়াতাড়ি ওদের খাওয়াতে হয় না। ফুটে বেরুবার পরের দিন ওদের খাওয়াতে হয়।

জেনিয়া বল্‌লো, 'আমি হলফ করে বলতে পারি তোরা নিশ্চয়ই সমস্ত রাত ঘুমসনি।'

—না··· আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম।

কোস্তিয়া প্রস্তাব করলো, 'তোরা বরঞ্চ একটুখানি ঘুমিয়ে নে আর আমরা ততক্ষণ দেখাশোনা করি।'

—বেশ বেশ। কিন্তু সত্যি বল যদি আর একটা ছানা বেরোয় তোরা আমাদের জাগিয়ে দিব।

—নিশ্চয়ই।

মিশ্‌কা আর আমি সোফায় শুয়ে পড়লাম আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি অনেকক্ষণ ধরেই আমার ঘুম পাচ্ছিল। প্রায় দশটার সময় ছেলেরা আমাদের জাগিয়ে দিল।

কোস্তিয়া চিৎকার কোরে বল্‌লো, 'আয়, দু'নম্বরের অদ্ভুত ঘটনা দেখবি, আয়!'

আধঘুমন্ত অবস্থায় বিড়বিড় করে আমি বল্‌লাম, 'কত নম্বরের অদ্ভুত কাণ্ড?' আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম রান্নাঘরটা ছেলের দলে ভরে গেছে।

সস্‌প্যানটাকে দেখিয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই যে এইখানে!'

লাফিয়ে উঠে মিশ্‌কা আর আমি ছুটলাম পাত্রটার ভেতর দেখতে। সেখানে তখন দুটো ছানা রয়েছে। তাদের একটাকে পেঁজা তূলোর মতো, আর গোল, আর গুঁড়ো ডিমের মতো হলদে রঙের দেখতে। সত্যিই সুন্দর!

আমি বল্‌লাম, 'সত্যিই এটা চমৎকার নয়! কিন্তু আমাদের প্রথমটার চেহারা ওরকম অপরিচ্ছন্ন কেন?'

ছেলেরা হেসে উঠে বল্‌লো, 'ওটাই বুঝি তোদের প্রথমটা।'

—কোনটা?

—লোমওলাটা।

—না, ওটা নয়। ঐ জিরজিরেটা।

—জিরজিরেটাই এখুনি ফুটে বেরিয়েছে। প্রথমটা শুকিয়ে গেছে বলেই ওরকম রোঁয়াওলা দেখাচ্ছে!

আমি বল্‌লাম, 'বাস্তবিক অদ্ভুত নয়! দ্বিতীয়টাও তাহলে শুকিয়ে গেলে ওরকম পেঁজা তূলোর মতো দেখাবে?'

—নিশ্চয়ই।

মিশ্‌কা প্রশ্ন করলো, 'ওটার নম্বর কী?'

ছেলের দল থতমত খেয়ে উঠলো।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমার ধারণা ছিল তোমরা জানো যে সব ডিমগুলোতেই নম্বর দেওয়া আছে।'

কোস্তিয়া বল্‌লো, 'না, আমরা কোনো নম্বর খুঁজে দেখিনি।'

আমি বল্‌লাম, 'খোলাটা নিয়ে দেখলেই আমরা জানতে পারবো। খোলাটা নিশ্চয়ই ভেতরে রয়েছে।'

মিশ্‌কা ইন্‌কুবেটরের ভেতরে দেখে চিৎকার করে উঠলো:

—দ্যাখ, দ্যাখ! আরো দুটো একেবারে নতুন ছানা এখানে রয়েছে!

প্রত্যেকেই দৌড়ে গেল ইন্‌কুবেটরের কাছে। সাবধানে নতুন ছানা দুটোকে বার কোরে মিশ্‌কা আমাদের সবাইকে দেখালো।

গর্বে বুক ফুলিয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এই দ্যাখ, এদের দ্যাখ, আমাদের জয়ের চিহ্নগুলোকে!'

অন্য দুটোর সঙ্গে সেগুলোকেও আমরা গরম রাখার পাত্রে রেখে দিলাম। আমাদের তখন চারটি ছানা। গরম হবার জন্যে তারা তখন ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেছিল।

ভাঙা খোলাগুলোকে ইন্‌কুবেটরের ভেতর থেকে বার করে মিশ্‌কা নম্বরগুলোকে খুঁজতে লাগলো।

সে বল্‌লো, '৪, ৮ আর ১০ নম্বর। কিন্তু কোন নম্বরটা কার?'

তখন অবশ্যই বলা অসম্ভব কোন ডিমটা থেকে কোনটা বেরিয়েছে। ছেলের দল হেসে উঠলো।

—নম্বরগুলো সব ঘুলিয়ে গেছে!

আমি বল্‌লাম, '৫ নম্বরেরটা এখনো ইন্‌কুবেটরের মধ্যে রয়েছে।'

মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো, 'তাই তো রয়েছে। ওটার হোলো কী? হয়তো মরে গেছে?'

৫ নম্বরেরটাকে বার কোরে গর্তটাকে আমরা সামান্য বড় করলাম।

ছানাটা ভেতরে চুপ করে ছিল। সেটা তার মাথাটা নাড়ালো।

—হুররে, এটা বেঁচে আছে!—আমরা চিৎকার কোরে উঠলাম আর সেটাকে আবার ইন্‌কুবেটরের মধ্যে রেখে দিলাম।

মিশ্‌কা বাকি ডিমগুলো পরীক্ষা করে দেখলো যে আর একটায় চিড় ধরেছে। সেটার নম্বর ৩। ছেলেরা হাততালি দিয়ে উঠলো:

—বেশ জমে উঠেছে!

কিছুক্ষণ পরে মায়া ঘরে এলো। তাকে আমরা ছানাগুলো দেখালাম।

—ঐটা আমার!—বলে সে রোঁয়াওলাটাকে ছিনিয়ে নিতে গেল।

আমি বল্‌লাম, 'একমিনিট সবুর কর। ছিনিয়ে নিসনি। আরো কিছুক্ষণ ঐ গরম রাখার পাত্রে না থাকলে ওটার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

—আচ্ছা তাই হবে, পরেই ওটাকে আমি নেবো। কিন্তু রোঁয়াওলাটাই আমার হবে। ঐ হাড় জিরজিরেটাকে আমি চাই না।

সেদিনটা ছিল রবিবার। স্কুল নেই বোলে ছেলের দল সবাই সমস্ত দিনটা আমাদের রান্নাঘরে কাটালো। কেউ বসেছিলো চেয়ারে, কেউ বা টুলে, কেউ বা সোফায়। মিশ্‌কা আর আমি বসে ছিলাম সম্মানের আসনে, ইন্‌কুবেটরটার পাশে। উনুনটার কাছে ডানদিকে নবজাত ছানাগুলো নিয়ে গরম রাখার পাত্রটা ছিল। উনুনের ওপরে ছিল গরম জলের পাত্রটা, আর জানালার কার্নিসে জই-ভরা বাক্সগুলো। ইতিমধ্যেই সেগুলো উজ্জ্বল সবুজ হয়ে উঠেছে। ছেলেরা হাসতে লাগলো, ঠাট্টা-তামাসা করতে লাগলো আর নানা ধরণের মজাদার গল্প বল্‌লো।

—তোমরা কি কেউ জানো যে, যখন ওদের ফুটে বেরুবার কথা তখন কেন ওরা ফুটে বেরোয়নি?—ছেলেদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করলো।—তোমরা শুক্রবার দিন ওদের আশা করেছিলে।

মিশ্‌কা উত্তর দিলো, 'আমি বুঝতে পারছি না কী ঘটেছে। বইতে লেখা আছে একুশ দিনের দিন ফুটে বেরুবার কথা কিন্তু আজকে তেইশ দিনের দিন। হয়তো বই যারা লিখেছে তারাই ভুল করেছে।'

লিওশা কুরচ্‌কিন বল্‌লো, 'কেউ ভুল কোরে থাকলে তোরাই করেছিস। কোনবার ডিমগুলোকে তোরা ইন্‌কুবেটরের মধ্যে রেখেছিলি?'

—তেসরা তারিখে। সেদিন ছিল শনিবার। আমার স্পষ্ট মনে আছে কারণ পরের দিনটা ছিল রবিবার।

জেনিয়া স্কভরৎসোভ বল্‌লো, ‘শোন শোন, একটা ভুল হয়েছে। শনিবার দিন ডিমগুলোকে রাখলে, কিন্তু একুশ দিনের দিন শুক্রবার হয়।’

ভিতিয়া স্মির্ণোভ বল্‌লো, ‘ও ঠিকই বলেছে। শনিবার দিন স্রুরু করলে একুশ দিনের দিনটা শনিবার হবার কথা। সপ্তাহে সাতটা দিন আছে আর একুশ দিন মানে পূরো তিন সপ্তাহ।’

হেসে সেনিয়া বব্‌রোভ বল্‌লো, ‘তিন সাততে একুশ! অন্তত নামতা কষলে তাই হয়।’

রেগে উঠে মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘নামতার কথা আমি জানি না তা ছাড়া ওভাবে তো আমরা হিসেব করিনি।’

—কী ভাবে গুণেছিলি?

আঙুলের কড় গুণ্‌তে গুণ্‌তে মিশ্‌কা বললো, ‘বলছি দাঁড়া। তেসরা হলো প্রথম দিন, চৌঠা হলো দ্বিতীয়, পাঁচুই হোলো তৃতীয়…’

শুক্রবার পর্যন্ত গুণে গিয়ে সে দেখালো একুশ দিন হয়েছে।

সেনিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ‘অদ্ভুত তো! নামতার হিসেবে একুশ দিনটা পড়ে শনিবারে, কিন্তু আঙুলের কড় গুণ্‌লে দেখা যাচ্ছে সেটা পড়ে শুক্রবারে।’

জেনিয়া বল্‌লো, ‘আবার দেখা তো কী ভাবে গুণলি।’

আঙুলগুলোকে আবার বাঁকিয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো, ‘এই দ্যাখ। তেসরা, শনিবার—প্রথম দিন, চৌঠা, রবিবার—হোলো দ্বিতীয় দিন…’

—এক মিনিট থাম! তুই ভুল করছিস! তেসরা তারিখে স্রুরু করলে হিসেবের মধ্যে সেদিনটাকে ধরে না।

—কেন?

—কারণ সেদিনটা তো তখনো শেষ হয়নি। চৌঠা তারিখ না হওয়া পর্যন্ত দিনটা শেষ হয় না তার মানে চৌঠা তারিখ থেকে গোণা দরকার।

এক ঝলকে মিশ্‌কা আর আমি বুঝতে পারলাম। নতুন কোরে গুণ্‌তে স্রুরু করে মিশ্‌কা দেখলো হিসেব মিলে যাচ্ছে।

সে বল্‌লো, ‘তাই তো। একুশ দিনের দিনটা ছিল গতকাল।’

আমি বল্‌লাম, ‘তাহলে যেমনটি হবার কথা ছিল তাই-ই হয়েছে। শনিবার

সন্ধেবেলা ডিমগুলোকে আমরা ইন্‌কুবেটরের মধ্যে রেখেছিলাম, আর প্রথম ডিমটা ফেটেছিল শনিবার দিন সন্ধেয়। ঠিক একুশ দিন পরেই।'

ভানিয়া লোজ্‌কিন বল্‌লো, 'ঠিক মতো গুণ্‌তে শিখলে কত ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায় দেখলি তো?'

সবাই হেসে উঠলো। মিশ্‌কা বল্‌লো, 'সত্যিই তাই। এরকম ভুল না করলে অনেক দুর্ভাবনা ও অসুবিধের হাত থেকে আমরা বাঁচতাম।'

জন্মদিন

সেদিনটা যখন শেষ হলো ইতিমধ্যেই তখন আমাদের গরম রাখার পাত্রে দশটা মুরগিছানা উঠে বসেছে। শেষ যেটা বেরিয়েছিল সেটার নম্বর ৫। কিছুতেই সেটা তার খোলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল না, ফলে তাকে সাহায্য করার জন্যে খোলার ওপরটা আমাদের ভাঙতে হয়েছিল। না ভাঙলে তখনো সেটা ভেতরে চিরকালের জন্যে বসে থাকতো। অন্য পাখীগুলোর তুলনায় সেটা ছোট আর দুর্বলও। সম্ভবতঃ খোলার ভেতরে বেশীক্ষণ ছিল বলেই ওরকম হয়েছে।

সন্ধের দিকে দেখা গেল ইন্‌কুবেটরের মধ্যে মাত্র দুটো ডিম রয়েছে। মাত্র দুটো ছিল বলেই সেদুটোকে ভারি করুণ দেখাচ্ছিল। তখনো তাদের গায়ে চিড় ধরার কোনো লক্ষণ নেই। ইন্‌কুবেটরের তলায় আমরা বাতিটা জ্বালিয়ে রাখলাম কিন্তু সে রাত্রেও তারা ফুটলো না। সমস্ত নবজাত ছানাগুলোই ভারি আরামে গরম রাখার পাত্রে রাত কাটালো। পরের দিন সকালে সেগুলোকে আমরা মেঝের ওপরে ছাড়লাম—তারা প্রাণপণে কিচ্‌মিচ্‌ করতে লাগলো দশ দশটা হলদে তুলোর বল যেন। উজ্জ্বল আলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তারা মিট্‌মিট করে তাকাতে লাগলো। কেউ কেউ শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে উঠলো, অন্যরা করতে লাগলো টলমল। কতকগুলো এমন কি দৌড়োতেও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখনো ভালো করে তারা শেখেনি। কখনো কখনো তারা তাদের ছোট্ট ঠোঁট মেঝের ওপরকার ছোট ছোট দাগগুলোয় ঠোক্‌রাচ্ছিল, এমন কি মেঝের ওপরকার চক্‌চকে পেরেকের মাথাগুলোর ওপর।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'দ্যাখ, ওদের ক্ষিদে পেয়েছে!'

তাড়াতাড়ি একটা ডিম সেদ্ধ করে সেটাকে খুব মিহি করে কুচিকুচি করে মেঝেয় আমরা ছড়িয়ে দিলাম, কিন্তু সেটাকে নিয়ে কী করতে হয় ছানাগুলো জানে না। হাতে করে আমরা তাদের খাওয়াতে চেষ্টা করলাম।

আমরা বল্‌লাম, 'খা, বোকার দল।'

কিন্তু ছানাগুলো খাবারটার দিকে ফিরেও তাকালো না। ঠিক তখুনি মিশ্‌কার মা রান্নাঘরে এলেন।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'মা, ওরা কিছুতেই ডিম খাচ্ছে না।'

—ওদের শেখাতে হবে।

—কী করে শেখাবো? ওদের তো বল্‌লাম খেতে কিন্তু কিছুতেই ওরা শুন্‌ছে না।

—ওভাবে ছানাদের শেখাতে নেই। আঙুল দিয়ে মেঝেয় টোকা দেওয়া দরকার।

মুরগিছানাগুলোর পাশে বসে মিশ্‌কা ডিমের টুক্‌রোগুলোর ঠিক পাশেই টোকা দিতে সুরু করলো। ছানাগুলো আঙুলটাকে খাবারের দিকে ঠোকরাতে লক্ষ্য করলো আর তারপর তারা অনুকরণ করে চললো। অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই পূরো ডিমটাই তারা খেয়ে ফেল্‌লো। তারপর আমরা পিরিচে জল রাখলাম আর সেটা তারা শেষ করলো। সেটা আর তাদের শেখাতে হলো না। আর তারপর তারা জড়াজড়ি হয়ে বসলো আর আমরা তাদের গরম হওয়ার জন্যে পাত্রের মধ্যে রেখে দিলাম।

সেদিন যখন মারিয়া পেত্রোভ্‌না ক্লাশে এলেন আমরা ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিলাম যে আমাদের মুরগিছানাগুলো ফুটে বেরিয়েছে। তিনি খুব অবাক আর খুসী হলেন।

—তাহলে আজ তোমাদের মুরগিছানাদের জন্মদিন,—তিনি বল্‌লেন।—আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাই।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম, আর ভিতিয়া স্মির্ণোভ বললো:

—তাদের জন্মদিনের জন্যে আমাদের নিশ্চয়ই উৎসব করা দরকার। আজই করা যাক!

সবাই প্রস্তাবটা অনুমোদন করলো।

—ঠিক কথা, উৎসব করা যাক, উৎসব করা যাক! মারিয়া পেত্রোভ্‌না, আমাদের ছানাগুলোর জন্মদিনের উৎসবে আসবেন তো?

—ধন্যবাদ, আনন্দের সঙ্গেই আসবো,—মারিয়া পেত্রোভ্‌না হেসে বল্‌লেন।—তাদের জন্যে আমি উপহারও নিয়ে যাবো।

ছেলের দল চিৎকার করে উঠলো, 'আমরা সবাই তাদের জন্যে উপহার নিয়ে যাবো!'

স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে মিশ্‌কা আর আমি তাদের আসার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের মুরগিছানাগুলো কি ধরণের উপহার পায় দেখার জন্যে আমাদের আর সবুর সইছিল না।

প্রথমে এলো সেনিয়া বব্‌রোভ একটা ফুলের তোড়া নিয়ে।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'ওটা দিয়ে কী হবে?'

—ওটা মুরগিছানাগুলোর জন্যে। এটাই আমার উপহার।

—মুরগিছানাদের জন্যে ফুলের কথা কে কবে শুনেছে। তারা তো ফুল খেতে পারে না, পারে কি?

—ওদের খেতে হবে না। ওরা চেয়ে দেখবে আর গন্ধ শুঁকবে।

—আহা, কী কথার ছিরি! যেন তারা আগে কখনো ফুল দেখেনি।

—দেখেইনি তো। এগুলোকে রাখার জন্যে আমাকে একটা পাত্র এনে দে। দেখিস এগুলোকে কী সুন্দর দেখাবে।

একটা পাত্র এনে ফুলগুলোকে আমরা জলের মধ্যে রাখলাম। তারপরে এলো সেরিওজা আর ভাদিক। তারা দুজনেই এনেছিল তোড়া তোড়া স্নো ড্রপ*।

মুখ ভার করে মিশ্‌কা ব্‌লো, 'সবাই ফুল আন্‌ছে কেন?'

আহত স্বরে ভাদিক বল্‌লো, 'আমাদের উপহার তোর বুঝি পছন্দ হচ্ছে না? উপহার নিয়ে খুঁৎ বের করা উচিত নয়।'

---

* স্নো ড্রপ—রুশ দেশে শীতকালের তুষার গলবার পরেই যে শাদা রঙের ফুল ফোটে তাকে স্নো ড্রপ বলে।

সে ফুলগুলোকেও আমরা জলে রাখলাম।

তারপরে এলো ভানিয়া লোজ্‌কিন আধসের জই গুঁড়ো নিয়ে। মিশ্‌কা সন্দিগ্ধ হয়ে বল্‌লো:

—আমার তো মনে হয় ওরা এটা খাবে না।

ভানিয়া বল্‌লো, 'তোরা চেষ্টা কোরে দেখতে পারিস।'

—না, মারিয়া পেত্রোভ্‌না আসা অবধি অপেক্ষা করা যাক। তাঁকে আমরা জিগ্‌গেস্‌ করে দেখবো।

ঠিক সেই মুহূর্তে মারিয়া পেত্রোভ্‌না এলেন।

খবরের কাগজে মুড়ে কী যেন তিনি এনেছেন। দেখা গেল সেটা একটা বোতল, দুধের মতো কী যেন একটা জিনিসে ভরা।

মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো, 'দুধ! আমরা তো কখনো ভাবিনি ওদের দুধ দিতে হবে!'

মারিয়া পেত্রোভ্‌না বল্‌লেন, 'এটা দই। ঠিক এই জিনিসটাই প্রথম কয়েক দিন ওদের দরকার। তোমরা দেখো কী রকম এটা ওরা পছন্দ করে।'

মুরগিছানাগুলোকে আমরা বাইরে ছেড়ে দিয়ে একটা পাত্রে সেই দই তাদের দিলাম। উৎসাহের সঙ্গে তারা সেটা খেয়ে ফেল্‌লো।

বেজায় খুসী হয়ে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'মুরগিছানাগুলোর জন্যে এটাকেই সত্যিকারের উপহার বলতে হয়। মুরগিছানার জন্মদিনের উৎসবে কী আনতে হবে সেটা জানা দরকার।'

একের পর এক 'অতিথিরা' আসতে সুরু করলো। ভিতিয়া আর জেনিয়া জোয়ার নিয়ে এলো। তারপর দৌড়ে এলো লিওশা কুরচ্‌কিন বাচ্চাদের জন্যে একটা ঝুমঝুমি নিয়ে।

—আমি তো ভেবে পেলাম না কী নিয়ে আসি। আসবার সময় পথে দেখলাম দোকানে এই ঝুমঝুমিটা রয়েছে, তাই আমি এটা নিয়ে এলাম।

ঠাট্টা করে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'বাস্তবিক কী বুদ্ধি। মুরগিছানাদের জন্মদিনের জন্যে একেবারে লাগসই উপহার।'

—কী করে আমি জানবো কী কিনতে হবে? হয়তো তারা ঝুমঝুমিটাই পছন্দ করবে।

রান্নাঘরের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে তাদের মাথার ওপর ঝুমঝুমিটা বাজাতে সুরু করলো। দই ঠুকরোনো ছেড়ে শোনবার জন্যে তারা মাথা তুললো।

অতিরিক্ত খুসী হয়ে লিওশা চিৎকার করে উঠলো, 'দেখলি তো! ওরা পছন্দ করেছে!'

সবাই হেসে উঠলো। মিশ্‌কা বল্‌লো:

—আচ্ছা, আচ্ছা। এখন ওদের শান্তিতে খেতে দাও।

মারিয়া পেত্রোভ্‌নাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে ওদের আমরা জই খাওয়াতে পারি কী না। তিনি বল্‌লেন ওরা যে কোনো শস্যই খেতে পারে যদি সেটা রান্না করা হয়।

মিশ্‌কা জানতে চাইলো, 'এটাকে কী করে রান্না করতে হয়?'

মারিয়া পেত্রোভ্‌না বল্‌লেন, 'ঠিক যে ভাবে তোমরা পরিজ রাঁধো।'

তক্ষুনি মিশ্‌কা আর আমি পরিজটা রাঁধতে গেলাম কিন্তু ঠিক তখনি আর একজন 'অতিথি' হাজির হোলো—কোস্তিয়া দেভিয়াৎকিন।

ছেলের দল জিগ্‌গেস করলো, 'তুই কি উপহার এনেছিস?'

কোস্তিয়া তার পকেট থেকে দুটো পিঠে বার করে বল্‌লো, 'এনেছি বই কি।'

ছেলের দল হেসে উঠলো, 'কী মজার উপহার।'

কোস্তিয়া বল্‌লো, 'জন্মদিনের উৎসবে সর্বদাই তো পিঠে থাকে, থাকে না কি?'

মিশ্‌কা সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলো, 'এগুলোর ভেতরে কী আছে?'

—ভাত।

—ভাত?—মিশ্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো।

কোস্তিয়ার হাত থেকে পিঠেগুলো ছিনিয়ে সে ভাতগুলোকে কুরে কুরে বার করে চল্‌লো।

কোস্তিয়া বল্‌লো, 'এই কী করছিস তুই! আমার কথায় বিশ্বাস হোলো না?'

কিন্তু মিশ্‌কা উত্তর দিলো না। একটা পিরিচের ওপর ভাতগুলোকে কুরে কুরে রেখে সে সেটা মুরগিছানাদের সাম্‌নে রাখলো। সেগুলোও তৎক্ষণাৎ সেটা ঠুক্‌রে চল্‌লো।

মায়া যখন দেখলো যে প্রত্যেকেই মুরগিছানাগুলোর জন্যে উপহার এনেছে সে তার ঘরে গিয়ে একটা লাল ফিতে এনে ছোট ছোট ফালি কোরে কেটে প্রত্যেকটা ছানার গলায় বেঁধে দিলো। আমরা মেঝের ওপর ছানাগুলোর কাছে ফুল ভর্তি পাত্রগুলোকে রাখলাম এবং ফুল আর ফিতে আর পিরিচ ভর্তি দই, ভাত আর পরিষ্কার জল—এই সব নিয়ে সত্যিকারের জন্মদিনের উৎসবের মতন দেখাতে লাগলো। কোস্তিয়া তাদের ঘাস খাওয়াতে চাইলো, কিন্তু মারিয়া পেত্রোভ্‌না বল্‌লেন যে সবুজ পাতা খাবার পক্ষে এখনো তারা খুব ছোট। পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার।

মুরগিছানাগুলোর যথেষ্ট আহার আর পান করা হলে তাদের ফিতেগুলো খুলে আমরা তাদের গরম রাখার পাত্রে রেখে দিলাম। রান্নাঘরের এক অংশে বেড়া দিয়ে সেখানে একপাত্র গরম জল রেখে দিতে মারিয়া পেত্রোভ্‌না উপদেশ দিলেন যাতে তারা গরম থাকতে পারে।

মারিয়া পেত্রোভ্‌না বল্‌লেন, 'সবচেয়ে ভালো হবে এদের গ্রামে নিয়ে যেতে পারলে। এখানে ঘরের মধ্যে তারা অসুস্থ হয়ে মরে যেতে পারে। তাদের তাজা হাওয়ার দরকার।'

আমরা তাঁকে আমাদের ইন্‌কুবেটরটা দেখালাম আর দেখালাম যে তখনো তার মধ্যে দুটো ডিম পড়ে রয়েছে।

মারিয়া পেত্রোভ্‌না বল্‌লেন, 'আমার মনে হচ্ছে ওগুলো থেকে আর ছানা ফুটে বেরুবে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এমনিতেই তোমরা যথেষ্ট সফল হয়েছো।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'তার কারণ সব ছেলেরাই একজোটে আমাদের সাহায্য করেছে। কেবল আমরা দুজন হলে পারতাম না।'
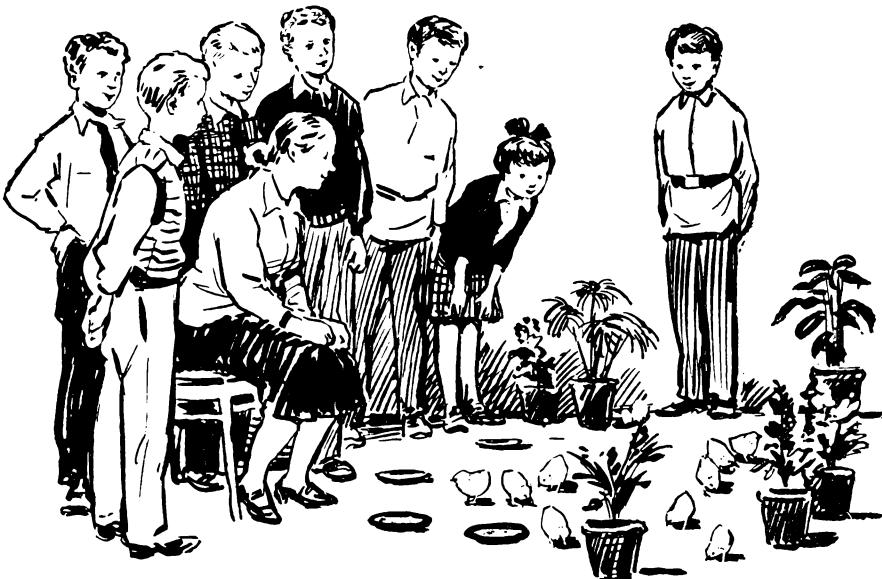
আমি বল্‌লাম, 'আমার তো ভয় হয়েছিল কিছুই হবে না কারণ একদিন আমি বেশী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর তাপটা নেমে গিয়েছিলো।'

মারিয়া পেত্রোভ্‌না বল্‌লেন, 'নষ্ট না হয়েও ডিমগুলো খানিক ঠাণ্ডা হতে পারে। কারণ সব সময় ধরেই তো মুরগি ডিমের ওপর বসে থাকে না। দিনে একবার কোরে ডিমগুলোকে খোলা অবস্থায় রেখে কিছু খেতে সে যায়। ইন্‌কুবেটরের মধ্যেকার ডিমগুলোকেও দিনে একবার কোরে ঠাণ্ডা করতে হয়। তাতে ভ্রূণগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়তে পারে। বেশী তাপ দেওয়া খুব খারাপ।'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'একবার আমি বেশী তাপ দিয়ে ফেলেছিলাম। ১০৪ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপ উঠেছিল।'

মারিয়া পেত্রোভ্‌না বল্‌লেন, 'সম্ভবত গুরুতর কোনো ক্ষতি হবার আগেই তুমি লক্ষ্য করেছিলে। কিন্তু যদি তুমি তাপকে অনেকক্ষণ ধরে বেশী রাখতে তাহলে ডিমগুলো নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে যেতো।'

সেই সন্ধেতেই বাকি দুটো ডিমকে আমরা ফাটিয়ে দেখলাম। তাদের দুটোর মধ্যেই আমরা দেখলাম অপরিণত ভ্রূণ রয়েছে। জীবন গিয়েছে থেমে আর জন্মাবার আগেই ছানাদুটো গিয়েছে মরে। হয়তো অতিরিক্ত গরম করার ফলেই এটা ঘটেছে।

বাতিটা আমরা নিভিয়ে দিলাম: সেটা পূরো তেইশ দিন ধরে জ্বলেছে। ধীরে ধীরে থারমোমিটারের পারাটা নেমে এলো। ইন্‌কবেটরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিন্তু উনুনের পাশে সস্‌প্যানের ভেতরে রইলো আমাদের 'আমুদে পরিবার'—রোঁয়াওলা হলদে দশটা মুরগিছানা।

গ্রামের পথে

আমাদের এই 'আমুদে পরিবার' একসঙ্গে সুখে বেঁচে রইলো। যতক্ষণ তারা কাছাকাছি থাকতো ততক্ষণ ছানাগুলো থাকতো ভালো। কিন্তু তাদের ভেতর কেউ যদি অন্যদের কাছ থেকে ছটকে পড়তো তাহলেই সেটা ভয় পেয়ে কিচ্ কিচ্ করে তার অন্যান্য ভাইদের খুঁজে বেড়াতো, আর যতক্ষণ না তাদের সে পেতো ততক্ষণ সে শান্ত হতো না।

গোড়ার থেকেই মায়া চেয়েছিল তার ছানাটাকে নিয়ে যেতে কিন্তু আমরা তাকে নিয়ে যেতে দিইনি, তারপর একদিন সে জানালো আর সে ধৈর্য ধরতে পারবে না আর সে একটা ছানাকে তুলে তার ঘরে নিয়ে গেল। আধঘণ্টা পরে কাঁদতে কাঁদতে সে ফিরলো:

—আর আমি সইতে পারছি না! ওটাকে কাঁদতে শুনে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই তার সয়ে যাবে। কিন্তু এমন করুণভাবে সেটা কেঁদে চলেছে যে আমি আর সইতে পারছি না!

যেই না সে ছানাটাকে মেঝেয় ছেড়ে দিলো সেটা সোজা চলে গেল ঘরের কোণে যেখানে অন্য ছানারা জড়াজড়ি করে বসে আছে।

তাদের জন্যে রান্নাঘরের একটা কোণ আমরা ঘিরে দিলাম, মেঝের ওপর পেতে দিলাম একটা অয়েলক্লথ আর লোহার একটা পাত্রে গরম জল ভরে রাখলাম সেখানে।

যাতে খুব তাড়াতাড়ি জলটা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে না পারে তার জন্যে পাত্রটার ওপর একটা বালিশ রাখলাম। গরম পাত্রটার চারদিকে বালিশের তলায় ছানাগুলো ঘেঁসাঘেঁসি কোরে এলো আর তাদের মায়ের ডানার তলায় থাকলে যেরকম আরামে থাকতো সেই ভাবেই রইলো। গরম জলে ভরা পাত্রটা তা দেওয়া মুরগির কাজ করতে লাগলো।

মাঝে মাঝে বাইরের উঠোনে তাদের আমরা নিয়ে যেতাম, কিন্তু সেটা তাদের পক্ষে বিপজ্জনক: অনেকগুলো রাস্তার কুকুর আর বেড়াল ওৎ পেতে থাকতো। ফলে অধিকাংশ সময়ই তাদের থাকতে হতো ভেতরে, আর তারা যথেষ্ট পরিমাণ টাট্‌কা হাওয়া পাচ্ছে না ভেবে আমরা খুব ভয় পেতাম। বিশেষ করে একটা ছানা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল। অন্যদের তুলনায় সেটা ছোট আর কম চন্‌মনে। সেটা একটা ভাবুক প্রকৃতির ছানা। প্রায়ই সেটা অন্যদের সঙ্গে ছুটাছুটি না করে চুপ করে বসে থাকতো আর খেতো খুব কম। সেটাই ৫ নম্বরেরটা, যেটা সব শেষে ফুটে বেরিয়েছিল।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমাদের নিশ্চয়ই এখন এদের নিয়ে গ্রামে যাওয়া উচিত। আমার ভয় হচ্ছে এগুলোর অসুখ হতে পারে।'

সেগুলোকে কাছ ছাড়ার কল্পনা আমরা সহ্য করতে পারলাম না ফলে দিনের পর দিন তাদের পাঠানো আমরা মুলতুবি রাখলাম।

একদিন সকালে মিশ্‌কা আর আমি যেমন প্রত্যহ তাদের খাওয়াতে যাই তেমনি গেলাম। এতোদিনে তারা আমাদের চিনেছে। গরম পাত্রের তলা থেকে দৌড়ে তারা আমাদের কাছে এলো। তাদের জন্যে আমরা এক প্লেট জোয়ার নিয়ে এসেছিলাম। পরস্পরকে তারা ঠেলে সরিয়ে একজনের ঘাড়ে একজন লাফিয়ে প্রত্যেকেই অন্যের আগে আসতে চেষ্টা করে তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে খেতে সুরু করলো। এমন কি একটা প্লেটের মধ্যে পা ডুবিয়ে দাঁড়ালো।

মিশ্‌কা বল্‌লো, '৫ নম্বরেরটা কই?'

সাধারণত ৫ নম্বরেরটা সবাইকার পেছনে পড়ে থাকতো। সবচেয়ে দুর্বল বলে অন্যরা তাকে পেছনে হটিয়ে দিতো। তাকে আলাদা করে প্রায়ই আমাদের খাওয়াতে

হতো। কখনো কখনো কিছুই সে খেতো না, কিন্তু সে একলা থাকতে চাইতো না বলে সবাইকার সঙ্গে সে দৌড়ে আসতো। কিন্তু এবারে তার কোনো পাত্তাই নেই। ছানাগুলোকে গুণে আমরা দেখলাম যে একটা কম পড়ছে।

আমি বল্লাম, 'হয়তো পাত্রটার পেছনে সে লুকিয়ে আছে।' পাত্রটার পেছনে চেয়ে দেখলাম সেটা মেঝেয় শুয়ে রয়েছে। আমি ভাবলাম সেটা বুঝি বিশ্রাম নিচ্ছে। হাত বাড়িয়ে আমি সেটাকে তুলে নিলাম। তার ছোট্ট দেহটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর তার মাথাটা তার সরু গলার থেকে নিষ্প্রাণ হয়ে ঝুলছে। ৫ নম্বরেরটা মারা গেছে।

সেটার দিকে অনেকক্ষণ আমরা চেয়ে রইলাম, এতো মন খারাপ হয়ে গেল যে আমরা কথা বলতে পারলাম না।

অবশেষে মিশ্‌কা বল্লো, 'আমাদেরই দোষ এটা! ওটাকে আমাদের গ্রামে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সেখানকার টাট্‌কা বাতাসে সে সুন্দর আর জোরালো হয়ে উঠতো।'

সেটাকে আমবা পেছনের উঠোনে একটি লাইম্ গাছের তলায় কবর দিলাম আর পরের দিনই অন্যগুলোকে সাজিতে ভরে আমরা গ্রামের দিকে চল্লাম। ছেলের দল সবাই মুরগিছানাদের বিদায় দিতে এলো। তার নিজের মুরগিছানাটাকে চুমু খেয়ে বিদায় দেবার সময় মায়া করুণভাবে কাঁদতে লাগলো। সেটাকে রেখে দিতে সে খুব চেয়েছিল, কিন্তু তার ভয় হোলো তার ছোট্ট ভাইদের ছেড়ে থাকতে তার খুব একলা লাগবে। তাই সে সেটাকে আমাদের সঙ্গে গ্রামে পাঠাতে রাজি হোলো।

শাল দিয়ে সাজিটা ঢেকে আমরা স্টেশনে চল্লাম। সাজির মধ্যে ছানাগুলো গরমে আর আরামে রইলো। সমস্ত পথ তারা শান্তভাবে ছিল, মাঝে মাঝে আস্তে কিচ্ কিচ্ কোরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। বিস্মিত হয়ে অন্যান্য যাত্রীরা আমাদের দিকে চাইতে লাগলো যখন তারা ছানাগুলো কিচ্‌কিচিনি শুনতে পেলো। আমাদের সাজির মধ্যে কি আছে তারা অনুমান করে নিলো।

আমাদের দেখে হেসে নাতাশা খুড়ি বল্লেন, 'আমার বাচ্চা মুরগি চাষীদের কী খবর, তোমরা আরো ডিমের জন্যে এসেছো, না?'

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'না। তার বদলে আপনার জন্যে কতকগুলো মুরগিছানা এনেছি।'

নাতাশা খুড়ি উঁকি মেরে সাজির ভেতরে দেখলেন।

—কি কাণ্ড!—তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।—কোথা থেকে অতগুলো মুরগিছানা তোরা পেলি?

—আমাদের ইন্‌কুবেটর দিয়ে ওগুলোকে আমরা ফুটিয়েছি।

—তোরা ঠাট্টা করছিস। কোনো পাখীর দোকান থেকে এগুলোকে নিশ্চয়ই কিনেছিস।

—না, নাতাশা খুড়ি। আপনার মনে পড়ে এক মাস আগে যে ডিমগুলো আমাদের দিয়েছিলেন? দেখুন, সেগুলোকে আপনার কাছে ফিরিয়ে এনেছি কিন্তু এখন সেগুলো ছানা হয়ে গেছে।

—কি অদ্ভুত!—নাতাশা খুড়ি চিৎকার করে উঠলেন।—আমার মনে হয় যখন তোরা বড় হয়ে উঠবি তখন তোরা মুরগি চাষী বা ঐ ধরনের কিছু হতে চাইব।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'এখনো সে কথা জানি না।'

—কিন্তু ছানাগুলোকে ছেড়ে যেতে তোদের মন কেমন করবে না?

উত্তরে মিশ্‌কা বল্‌লো, 'আমাদের দারুণ মন কেমন করবে। কিন্তু জানেন তো

সহরে থাকা এদের পক্ষে ভালো নয়। এখানকার হাওয়া বিশুদ্ধ ও তাজা আর দৌড়ো-দৌড়ি করার পক্ষেও এখানে এদের অনেক জায়গা। তারা বড় হয়ে উঠবে সুন্দর জোরালো পাখী হয়ে। মুরগিগুলো আপনার জন্যে ডিম পাড়বে আর মোরগগুলো ডাকবে। একটা মুরগিছানা মরে গেছে আর সেটাকে আমরা লাইম গাছের তলায় কবর দিয়েছি।'

আমাকে আর মিশ্‌কাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নাতাশা খুড়ি বল্‌লেন, 'আহা বেচারারে। কিন্তু দুঃখ পেয়ো না। এর আর কোনো উপায় ছিল না। অন্য সবগুলোই বেঁচে থাকবে।'

সাজির ভেতর থেকে মুরগিছানাগুলোকে আমরা বাইরে ছেড়ে দিলাম। আর রোদে তাদের লাফ ঝাঁপ দেখতে লাগলাম। নাতাশা খুড়ি বল্‌লেন যে তিনি তাঁর মুরগিটাকে ডাকতে শুনেছেন। মিশ্‌কা আর আমি তাঁর সঙ্গে দৌড়ে গেলাম চালাটার ভেতর সেটাকে দেখতে। চুবড়ীটার ভেতর সেটা বসে ছিল আর চারদিক থেকে বেরিয়ে এসেছিল খড়। আমাদের দিকে এমন কট্‌মট্‌ করে সে চাইলো যে মনে হলো আমরা যেন তার ডিমগুলো নিতে এসেছি বলে ভয় পেয়েছে।

মিশ্‌কা বল্‌লো, 'খুব ভালো। আমাদের ছানাগুলোর এবার খেলার সঙ্গী জুটবে! কী মজাতেই না তারা থাকবে।'

সমস্তদিন আমরা গ্রামে কাটালাম। বনের মধ্যে আমরা বেড়াতে গেলাম আর নদীতে দিলাম ডুব। গতবার আমরা যখন সেখানে এসেছিলাম সবে তখন বসন্তকাল সুরু হয়েছে, মাঠগুলো তখনো খালি ছিল। ট্রাক্টরগুলো তখন মাটি কাটতে ব্যস্ত ছিল। এখন সমস্ত মাঠ সবুজ চারায় ভরে গেছে আর সেগুলো ছড়িয়ে পড়েছে এক বিরাট সবুজ গাল্‌চেয়—যতদূর দেখা যায়।

বনের মধ্যেটা ভারি সুন্দর। ঘাসের ওপর নানা জাতের গুবরে ও অন্যান্য নানা পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে, চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতি আর প্রত্যেক গাছে গাছে পাখীরা গান গাইছে। এতো চমৎকার লাগছিল যে বাড়ি ফিরতে আমাদের ইচ্ছেই করলো না। আমরা ঠিক করলাম গ্রীষ্মকালে এখানে এসে নদীর তীরে একটা তাঁবু বানিয়ে রবিনসন ক্রুশোর মত থাকবো।

অবশেষে কিন্তু যাওয়ার সময় হয়ে এলো। নাতাশা খুড়ির কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। ট্রেনে খাবার জন্যে আমাদের তিনি এক একটুকরো পিঠে দিলেন আর প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা তাঁর কাছে যেন আসি। ছেড়ে যাবার আগে আমাদের মুরগিছানাগুলোকে শেষবার দেখার জন্যে আমরা উঠোনে গেলাম। মনে হলো ইতিমধ্যেই তারা যেন এটাকে নিজেদের বাড়ী করে নিয়েছে। আনন্দে কিচ্ কিচ্ করতে করতে তারা গাছের আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখনো সবাই তারা কাছে কাছে আছে আর কিচ্ কিচ্ করে চলেছে যাতে তাদের মধ্যে কেউ যদি ঘাসের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সহজেই খুঁজে পায়।

মিশ্কা বল্লো, 'আমাদের আমুদে পরিবার! তাজা বাতাসে আর রোদে ফুর্তিতে থাকো, বড় হয়ে ওঠো আর জোরালো হও আর হয়ে ওঠো সুন্দর সুস্থ পাখী। সর্বদা একসঙ্গে থাকবে আর একের জন্যে সবাই মিলে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। মনে রেখো সবাই তোমরা ভাই, একই মায়ের সন্তান··· মানে··· একই ইন্‌কুবেটরের, যেখানে তোমরা পাশাপাশি শুয়েছিলে যখন তোমরা সাধারণ ডিম ছিলে, যখন তোমরা দৌড়োতে বা কথা বলতে··· মানে··· কিচ্ কিচ্ করতে পারতে না···। আর আমাদের ভুলে যেয়ো না কারণ আমরাই ইন্‌কুবেটরটা বানিয়েছিলাম, আর তার মানে হলো আমরা না থাকলে তোমরা এখানে থাকতে না আর জানতে পারতে না বেঁচে থাকা কি আশ্চর্য ঘটনা!'

এই হোলো গল্পটা।

Н. НОСОВ

ВЕСЁЛАЯ СЕМЕЙКА